অসম
প্রত্যাখান করেছে
মমতাকে
— পৃঃ ১১

দাম : দশ টাকা

স্বস্তিকা

রাজ্যের
সংবাদমাধ্যমে
রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ
—পৃঃ ২১

৭০ বর্ষ, ৫২ সংখ্যা।। ২০ আগস্ট ২০১৮।। ৩ ভাদ্র - ১৪২৫।। যুগাব্দ ৫১২০।। website : www.eswastika.com

এন আর সি রূপায়িত হলে
রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধ বাধবে

—মমতা ব্যানার্জি
মুখ্যমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গ

মুসলমান ভোটব্যাঙ্ক অক্ষত রাখতেই মমতার এন আর সি বিরোধিতা

এন আর সি নিয়ে মমতা
ব্যানার্জি মুসলমান তোষণের
রাজনীতি করছেন। মমতার বক্তব্যের
প্রতিবাদে আমি দল থেকে পদত্যাগ করছি

—দীপেন পাঠক
অসম রাজ্য সভাপতি, টিএমসি

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭০ বর্ষ ৫২ সংখ্যা, ৩ ভাদ্র, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ

২০ আগস্ট - ২০১৮, যুগাব্দ - ৫১২০,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

অফিস হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2016-18

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক রণেন্দ্রলাল ব্যানার্জী কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

পেনশনের টোপ দিয়ে বৃদ্ধ, দুঃস্থ, অসুস্থ, অবসরপ্রাপ্ত সাংবাদিকদের এপ্রিলফুল করলেন নেত্রী
▯ গূঢ়পুরুষ ▯ ৬

খোলা চিঠি : বাঙাল তুমি কার? ▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ৭

গান্ধী টুপি পরে থাকাদের তুলনায় স্যুট-বুট পরে থাকারা কি বেশি দুর্নীতিগ্রস্ত? ▯ স্বামীনাথন আয়ার ▯ ৮

অসম প্রত্যাখ্যান করেছে মমতাকে
▯ রন্তিদেব সেনগুপ্ত ▯ ১১

দ্রিঘাংচুর ভূয়োদর্শন : 'মানুষ নাই রে দেশে' ▯ ১৩

বর্তমান থেকে ভবিষ্যতের পথে ডিজিটাল ভারত
▯ অনিন্দ্য বন্দ্যোপাধ্যায় ▯ ১৫

রাজ্যের সংবাদমাধ্যমে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ
▯ নিবারণ চক্রবর্তী ▯ ২১

নাগরিকপঞ্জি অথবা রাক্ষসের প্রাণভোমরা
▯ প্রবাল চক্রবর্তী ▯ ২৩

মমতার স্বপ্নাদেশে বাঙালি বুদ্ধিজীবীর পুতুলনাচ
▯ চন্দ্রভানু ঘোষাল ▯ ২৫

অসম ভারতকে বিদেশিমুক্ত করার পথ দেখিয়েছে, এরপর পশ্চিমবঙ্গ ▯ মোহিত রায় ▯ ২৬

অসমের এন আর সি নিয়ে মমতার স্বার্থসিদ্ধির রাজনীতি ভেস্তে গেল ▯ ধর্মানন্দ দেব ▯ ২৮

মিলন তিথি ঝুলন ▯ নন্দলাল ভট্টাচার্য ▯ ৩১

বাঙালিদের রাখিবন্ধন ▯ রঞ্জন সরকার ▯ ৩৩

গল্প : নুটুবিহারি ▯ সন্দীপ চক্রবর্তী ▯ ৩৫

কংগ্রেস নেতারা ক্ষুদ্রস্বার্থে ভারতের অস্মিতাকে অস্বীকার করছেন ▯ ড. মনমোহন বৈদ্য ▯ ৪১

মার্কসবাদ অথবা বুর্জোয়া গবেষণাগারে বানানো সর্বহারার টনিক (২য় পর্ব) ▯ দেবাশিস লাহা ▯ ৪৩

এতদিনে উদ্বাস্তু আন্দোলনের দাবি পূর্ণ হলো
▯ ড. জিষ্ণু বসু ▯ ৪৬

নিয়মিত বিভাগ

উবাচ : ১০ ▯ চিঠিপত্র : ১৯-২০ ▯ নবাঙ্কুর : ৩৮-৩৯ ▯ রঙ্গম : ৪৫ ▯ চিত্রকথা : ৪৯ সাপ্তাহিক রাশিফল : ৫০

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে
২৭ আগস্ট, '১৮

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

প্রকাশিত হবে
২৭ আগস্ট, '১৮

ঊনিশে বিজেপি কি একাই তিনশো?

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, ঊনিশের লোকসভা নির্বচনে বিজেপি তিনশোর বেশি আসনে জয়লাভ করতে পারে। কিছুদিন আগে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহের মুখেও একই কথা শোনা গেছে। দুই নেতার ভবিষদ্‌বাণীর সমর্থন মিলেছে সাম্প্রতিক কয়েকটি প্রাক-নির্বাচনী সমীক্ষাতেও। স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় থাকবে লোকসভা নির্বচন পূববর্তী ভারতের প্রকৃত পরিস্থিতি সম্পর্কে বিশ্লেষণাত্মক কয়েকটি রচনা। লিখবেন— রন্তিদেব সেনগুপ্ত, চন্দ্রভানু ঘোষাল প্রমুখ।

দাম একই থাকছে।। দশ টাকা

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন। তবে ইউ বি আই-এর শাখা থেকে পাঠালে কোনো ব্যাঙ্ক চার্জ লাগবে না।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : SWASTIKA

A/C. No. : 0314050014429

IFSC Code : UTBI0BIS158

Bank Name :

United Bank of India

Branch : Bidhan Sarani

সানরাইজ®
সর্ষে পাউডার

SUNRISE® PURE

স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

প্রশ্নটি থাকিয়াই যাইবে

কয়েক বৎসর পূর্বে একটি উচ্চমার্গের বাংলা চলচ্চিত্রে একটি অত্যাশ্চর্য চরিত্রের দর্শন পাওয়া গিয়াছিল। চরিত্রটি সর্বদাই এক শঙ্কায় তাড়িত থাকিত, এক অজানা ভয় তাহার পিছু লইয়াছিল। যাহারই সান্নিধ্যে আসিত এই চরিত্রটি, তাহাকে সে জিজ্ঞাসা করিত—'আমার কোনো ভয় নাই তো?' এই অজানা ভয় একদিন তাহার জীবনে সত্য হইয়াই উঠিয়াছিল। এক অজ্ঞাত আততায়ীর হাতে প্রাণ দিতে হইয়াছিল তাহাকে। সম্প্রতি পঞ্চায়েত নির্বাচন লইয়া দেশের সর্বোচ্চ আদালতে যে শুনানি হইয়াছে, সেই শুনানির বিবরণ পাঠ করিতে গিয়া চলচ্চিত্রের পর্দায় দেখা এই চরিত্রটির কথা আবার মনে পড়িল। 'আমার কোনো ভয় নাই তো'—এই প্রশ্নটি যে ওই অদ্ভুতদর্শন চরিত্রের প্রলাপবাক্য ছিল না, বরং এই রাজ্যের সাধারণ নাগরিকবৃন্দেরই অন্তরের জিজ্ঞাসা—পঞ্চায়েত নির্বাচনের শুনানিতে তাহাই যেন আবার নূতন করিয়া প্রতিভাত হইল। এই রাজ্যে পঞ্চায়েতের ৫৮ হাজার আসনের ভিতর ২০ হাজারের বেশি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় নাই। এইসব আসনগুলিতে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত ঘোষণা করা হইয়াছে শাসক দলের প্রার্থীদেরই। এই বিপুল সংখ্যক আসনে বিরোধী দলের প্রার্থীদের ভয় দেখাইয়া মনোনয়ন পত্র জমা দিতে দেওয়া হয় নাই—এই অভিযোগ প্রথমাবধিই উঠিতেছিল। যদিও রাজ্য নির্বাচন কমিশনের দপ্তরে অভিযোগ জমা পড়িয়াছিল মোটে ১,৭৭০টি। শাসক দলের বাধায় তাহাদের প্রার্থীরা মনোনয়ন জমা দিতে পারেন নাই—এই অভিযোগেই রাজ্যের দুই বিরোধী দল বিজেপি এবং সিপিএম দেশের সর্বোচ্চ আদালতে মামলা করিয়াছে।

এই মামলার শুনানিতে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি দীপক মিশ্রের বেঞ্চ রাজ্য সরকারকে একটি অস্বস্তিকর প্রশ্নের মুখে দাঁড় করাইয়া দিয়াছে। সর্বোচ্চ আদালতে রাজ্য সরকার শাক দিয়া মাছ ঢাকিবার চেষ্টা করিয়াছিল। বিরোধীদের অভিযোগ উড়াইয়া দিয়া রাজ্য সরকার বলিয়াছিল, মাত্র ১৭৭০টি অভিযোগ জমা পড়িয়াছে। কাজেই বিরোধীদের অভিযোগের সারবত্তা নাই। কিন্তু শাকে যেমন মাছ ঢাকা পড়ে নাই, তেমনই এইসব অসাড় যুক্তিতে চিড়াও ভিজে নাই। ফাঁকটি কোথায়, তাহা ধরিয়া ফেলিতে সুপ্রিম কোর্টের মহামান্য বিচারপতিদের বিশেষ কসরত করিতে হয় নাই। রাজ্য সরকারের এহেন যুক্তির পাল্টা হিসাবে বিচারপতিরা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—এমন তো নয় যে, ভয়ের কারণে কেহ অভিযোগ জানাইতেই যান নাই? প্রশ্নটি যথার্থ এবং রাজ্য সরকারের পক্ষে অস্বস্তিকর। ফলে স্বাভাবিকভাবেই রাজ্য সরকার এই প্রশ্নের কোনো যথাযথ উত্তর দিতে পারে নাই। সুপ্রিম কোর্ট আরও প্রশ্ন তুলিয়াছে, যেসব বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজয়ী ঘোষিত কেন্দ্র হইতে কোনো লিখিত অভিযোগ আসে নাই—সেইখানে পরিস্থিতি যাচাই করা হইয়াছিল কি? স্বাভাবিকভাবেই এরও কোনো উত্তর রাজ্য সরকারের কাছে ছিল না।

সুপ্রিম কোর্ট আঘাতটি বড় মোক্ষম জায়গায় হানিয়াছে। ১৭৭০ সংখ্যাটি দিয়া যে পশ্চিমবঙ্গে সন্ত্রাস এবং হিংসার মাত্রাটি পরিমাপ করা যাইবে না—ইহা মাননীয় বিচারপতিরা বুঝিয়াছেন। শাসক দলের সন্ত্রাস এমন পর্যায়ে পৌঁছাইয়াছিল যে, রাজ্য নির্বাচন কমিশনার পর্যন্ত মনোনয়ন গ্রহণের সময় বর্ধিত করিয়া বিজ্ঞপ্তি জারি করিবার মাত্র কয়েকঘণ্টা পর তাহা প্রত্যাহার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। নির্বাচন কমিশনারের বাড়ি উজাইয়া গিয়া শাসক দলের নেতা-মন্ত্রীদের হুংকার-আস্ফালন ভারতের সংসদীয় রাজনীতিতে ইতিমধ্যেই কলঙ্কের ছিটা লাগাইয়াছে। মনোনয়ন এবং ভোট গ্রহণ পর্বে রাজ্য পুলিশকে কার্যত ঠুঁটা জগন্নাথ বানাইয়া রাখিয়া বিরোধী দলের উপর অবাধে হামলা হইয়াছে। সমস্ত সংবাদমাধ্যমে তাহা সবিস্তারে প্রকাশ পাইয়াছে। পুলিশ শাসক দলের পোষ্য ক্যাডারের ন্যায় আচরণ করিয়াছে। ফলে, অভিযোগ জানানোর রাস্তাটিই তো বন্ধ। সুপ্রিম কোর্টের মাননীয় বিচারপতিরা রাজ্য প্রশাসনের এই নির্লজ্জ, নিষ্ঠুর, অগণতান্ত্রিক আচরণের প্রতিই দৃষ্টি আকর্ষণ করাইয়াছেন।

যাহা সত্য, তাহা চিরকাল অন্ধকারে থাকে না। সত্য আপনা হইতেই আলোতে প্রকাশিত হয়। রাজ্য সরকার বালিতে মুখ লুকাইতেই পারেন। কিন্তু যে প্রশ্নটি মাননীয় বিচারপতিরা উত্থাপন করিয়াছেন, তাহা কিন্তু থাকিয়াই যাইবে।

সুভাষিতম্

প্রজ্ঞাবচনহীনশ্চ কর্মহীনশ্চ যো নরঃ।

নিরর্থা চেতনা তস্য ভস্মন্যাহুতয়ো যথা।। (চাণক্য নীতি)

যে ব্যক্তি বুদ্ধিসম্মত কথা বলতে পারে না এবং কর্মোপযুক্ত শক্তি যার নেই, তার চৈতন্য ভস্মে প্রদত্ত আহুতির মতোই নিষ্ফল।

পেনশনের টোপ দিয়ে বৃদ্ধ, দুঃস্থ, অসুস্থ, অবসরপ্রাপ্ত সাংবাদিকদের এপ্রিল ফুল করলেন নেত্রী

সম্প্রতি জঙ্গলমহলে সফরে গিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন বিজেপিকে নয়, একমাত্র তাঁকেই বিশ্বাস করতে। কারণ তিনি যে প্রতিশ্রুতি দেন তা কাজে করে দেখান। মমতার সংস্পর্শে যাঁরা এসেছেন অথবা যাঁরা একদা তাঁর নয়নের মণি ছিলেন তাঁরা সকলেই এখন চোখের বালি। একদা কংগ্রেস নেতা এবং পরবর্তীকালে তৃণমূল কংগ্রেসের অন্যতম প্রধান প্রতিষ্ঠাতা পঙ্কজ বন্দ্যোপাধ্যায়কে ক্ষমতায় আসার পর মমতা চরম হেনস্থা করেন। তিনি চেয়েছিলেন মিথ্যা জালিয়াতির মামলায় ফাঁসিয়ে পঙ্কজবাবুকে জেলে ঢোকাতে। বৃদ্ধ বয়সে অকৃতদার পঙ্কজবাবু তৃণমূল ত্যাগ করে অসম্মান থেকে আত্মরক্ষা করেন। পারতপক্ষে বাড়ির বাইরে বেরন না। শেষ জীবনটা গৃহবন্দি হয়ে কাটাচ্ছেন। মমতা যখন একমাত্র তৃণমূল সাংসদ তখন আঙুলে গোনা কয়েকজন সাংবাদিক বিকেলের দিকে হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটে তাঁর সঙ্গে দেখা করতেন। এই দলে ছিলেন দ্য টেলিগ্রাফের সিনিয়ার সাংবাদিক সত্যম ঘোষ। সত্যমবাবুর মমতাকে পাদপ্রদীপের আলোয় তুলে ধরার চেষ্টাকে কেন্দ্র করে অফিসের অন্য সাংবাদিকদের বিদ্রূপ মাঝে মাঝে সহ্যের সীমা ছাড়াতো। অবসর নেওয়ার দিন পর্যন্ত সত্যমবাবুর মমতা প্রীতি অক্ষুণ্ণ ছিল। বৃদ্ধ বয়সে তাঁর একমাত্র কন্যার বিবাহে নিমন্ত্রণ করতে তিনি হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটে মমতার বাসভবনে যান। মমতা সাফ বলে দেন তিনি দেখা করবেন না। বিয়ের কার্ড তাঁর অফিসে রেখে যেতে।

একদা মমতার মিডিয়া অ্যাডভাইসার কুণাল ঘোষ আমার দেখা চতুরতম সাংবাদিক। কীভাবে রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীদের নেক নজরে পড়ে আত্মস্বার্থ চরিতার্থ করতে হয় তা কুণালবাবুর কাছে শিখতে হয়। আলিমুদ্দিনে অনেক ঘোরাঘুরি করেও তিনি সুবিধা করতে পারেননি। উল্টে সংবাদ প্রতিদিন খবরের কাগজের মাকু সাংবাদিকদের চাপে পড়ে তাঁর চাকরি যায়। এরপর কুণালবাবু মমতার শরণাপন্ন হন। মমতার এবং প্রণববাবুর অনুরোধে কাগজের মালিক টুটু বসু কুণালবাবুকে সংবাদ বিভাগের সর্বেসর্বা করে পুনর্নিয়োগ করেন।

গূঢ় পুরুষের কলম

কুণালবাবু দায়িত্ব নিয়েই প্রথমেই সংবাদ প্রতিদিন কাগজ থেকে মাকু-সেকু সাংবাদিকদের বিতাড়িত করেন। মমতার সৌজন্যে এই সময় সারদা, রোজভ্যালি, অ্যালকেমিস্ট ইত্যাদি চিটফান্ড ব্যবসায়ীদের রমরমা চলছে। জলপ্রপাতের মতো হু হু করে টাকা ঢুকছে তৃণমূলের ফান্ডে। কুণালবাবু মমতার দাক্ষিণ্যে তখন রাজ্যসভার সাংসদ। কুণালবাবু তাঁর প্রভাব খাটিয়ে সারদা চিটফান্ডের টিভি চ্যানেল-১০ এর সর্বেসর্বা হয়ে বসলেন। ডিল হলো সংবাদ প্রতিদিন সারদার এজেন্সি হয়ে চ্যানেল-১০ টিভি চালাবে। বিনিময়ে সারদার মালিক বছরে প্রায় ১৫০ কোটি টাকা দেবে সংবাদ প্রতিদিন কাগজের মালিককে। এই ডিল হয় মমতাকে জানিয়ে। কারণ, তখন কুণাল ঘোষ মমতার চোখের মণি। মমতার অতি বিশ্বাসভাজন। মমতাকে বিশ্বাস করে এখন পথের ভিখারি হয়েছে সারদার সুদীপ্ত সেন, রোজভ্যালির গৌতম কুণ্ডু, কুণাল ঘোষ। এত কথা বলতে হলো মমতাকে বিশ্বাস করার ফল কী হয় তা বোঝাতে।

কলকাতার অনেক সাংবাদিকের আজও বিশ্বাস যে মমতা যা বলেন, তা কাজে করে দেখান। অথচ কলকাতার সাংবাদিকদের অভিজ্ঞতা অন্য কথা বলছে। মেয়ো রোড, রেড রোডে কর্মরত সাংবাদিক ও চিত্রসাংবাদিকদের বিনা প্ররোচনায় যখন পুলিশ লাঠিচার্জ করলো তখন মমতা দুঃখ প্রকাশ করার সৌজন্য দেখাননি। উল্টে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগে (গৌরী লঙ্কেশ) কলকাতা প্রেস ক্লাবের প্রতিবাদ মিছিলে মোমবাতি হাতে নেতৃত্ব দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেদিন প্রেসক্লাবের সদস্যদের একজনও মমতার কাছে জানতে চাননি যে মহিলা পুলিশ অফিসারের নির্দেশে সাংবাদিকদের লাঠিপেটা করা হয় তাঁকে একমাসের মধ্যে উচ্চপদে প্রমোশন দেওয়া হলো কেন? সাংবাদিকদের মনের ও শরীরের ক্ষতে মলম দিতে গত ২ ফেব্রুয়ারি বিধানসভায় মমতা ঘোষণা করেন অবসরপ্রাপ্ত দুঃস্থ, অসুস্থ, রোজগারহীন সাংবাদিকদের জন্য মাসিক ৪৫০০ টাকা পেনশন দেওয়া হবে। ১ এপ্রিল থেকে ওই পেনশন চালু হবে। পেনশন চালু হয়নি। যদিও সরকারি গেজেট নোটিফিকেশন ৩০ মার্চ মধ্যরাত্রে অনলাইনে ঘোষিত হয়। এরপর প্রায় ১০০ বৃদ্ধ, সহায়হীন সাংবাদিক নবান্নে তথ্য দপ্তরে নির্দিষ্ট কর্তার কাছে আবেদনপত্র জমাও দেন। এই নিয়ে তথ্য দপ্তরের করণিকরা বলছেন, ''দিদি বৃদ্ধ সাংবাদিকদের সঙ্গে রঙ্গ রসিকতা করেছেন। উনি দেখতে চাইছিলেন যে বুড়োদের আই কিউ কতটা জোরালো আছে। যাঁরা পেনশনের জন্য আবেদন জানিয়েছেন তাঁদের জানা উচিত ছিল যে ১ এপ্রিল 'অল ফুলস্ ডে'। বুড়ো, দুঃস্থ, অসুস্থ সাংবাদিকরা এপ্রিল ফুল হয়েছেন। এ'রকম করুণ রসিকতা একমাত্র তৃণমূল নেত্রীই করতে পারেন। সারা দেশে এর দ্বিতীয় উদাহরণ পাওয়া যাবে না। মমতাকে বিশ্বাস করার পরিণাম কী হয় জঙ্গলমহলের মানুষ জানেন। আর জানেন বলেই তাঁরা এখন বিজেপিকে চাইছেন। ■

‘বাঙাল’ তুমি কার?

মাননীয় দিলীপ ঘোষ
রাজ্য সভাপতি, বিজেপি
৬ নম্বর মুরলীধর সেন লেন, কলকাতা

মাননীয় দিলীপবাবু,

কলকাতার জনসভায় সব কোয়েশ্চেনের উত্তর দিয়ে গিয়েছেন অমিত শাহ। আপনার দলের হেড স্যার রীতিমতো নোটস রেডি করে দিয়েছেন। ‘এন আর সি কী এবং কেন’ কিংবা ‘এন আর সি সম্পর্কে যাহা জান লিখ’ কিংবা ‘নাগরিকপঞ্জির গুরুত্ব ও উপকারিতা ব্যাখ্যা কর’— এমন সব প্রশ্নের উত্তর মেয়ো রোডের সমাবেশ থেকে দিয়ে দিয়েছেন অমিত শাহ। নাগরিকপঞ্জি নিয়ে আপনার দলের ব্যাখ্যা সর্বভারতীয় সভাপতি স্পষ্ট করে দিয়ে গেলেন কর্মী, সমর্থক, নেতাদের। শুনিয়ে দিয়ে গেলেন সামনের লোকসভা নির্বাচন পরীক্ষার বড় প্রশ্নের উত্তর--- ‘শরণার্থী ও অনুপ্রবেশকারীর মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ কর।’

আপনার সর্বভারতীয় সভাপতি নিজের স্টাইলে পরীক্ষাও নিলেন সমাবেশে। আরও জোরে, আরও জোরে, আরও জোরে জানতে চাইলেন— “এন আর সি হোনা চাহিয়ে ইয়া নেহি চাহিয়ে? ঘুসপেটিয়োঁ কো দেশ সে নিকালনা চাহিয়ে ইয়া নেহি চাহিয়ে?”

জন-সমাবেশ থেকে সদর্থক উত্তর আসায় আপনি নিশ্চয়ই আহ্লাদিত। কিন্তু একটু সতর্ক থাকতে হবে দাদা। কারণ, তৃণমূল কংগ্রেস ইতিমধ্যেই ‘মা-মাটি-বাঙাল’ স্লোগান অস্ত্রে শান দিতে শুরু করে দিয়েছে। ঠিক যেমনটা দিয়েছিল ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে।

২০১৪ সালে লোকসভা নির্বাচনের আগে বাংলায় গুটিকয় সভা করেছিলেন নরেন্দ্র মোদী। তারই মধ্যে হুগলির শ্রীরামপুরের সভা থেকে বলেছিলেন, কেন্দ্রে ক্ষমতায় এলে বাংলাদেশিদের তাড়ানো হবে। বাক্স-প্যাঁটরা গুছিয়ে রাখতেও বলেছিলেন। অনুপ্রবেশকারী তাড়ানোর সেই হুঁশিয়ারিকে রাতারাতি ইস্যু বানিয়ে ফেলে তৃণমূল কংগ্রেস। পালটা প্রচার শুরু হয়ে যায় যে, পূর্ববঙ্গ থেকে আগত ‘বাঙাল’-দের দেশ থেকে খেদাতে চায় বিজেপি। বড় মঞ্চ থেকে তো বটেই পূর্ববঙ্গ থেকে আগত মানুষের সংখ্যা যেখানে বেশি সেখানে প্রচারের অভিমুখটাই বদলে যায়। বলা হয়, বিজেপি এলে তাদের--- সব বাঙালকেই বাংলাদেশে ফেরত চলে যেতে হবে।

সেই অস্ত্র কাজে দিয়েছিল অনেকটাই। এবার লোকসভা ভোটের আগে সেই অস্ত্র নতুন করে এনে দিয়েছে অসম। বিজেপি যতই পুরনো দিনের কথা মনে করাতে চাক না কেন রাজনীতি সব সময়েই ‘বর্তমান’ নির্ভর। ২০০৫ সালের আগস্ট আর ২০১৮ সালের আগস্ট মাসের মধ্যে ১৩টা বছরের তফাত। সেবার আগস্টে লোকসভায় রাজ্য থেকে অনুপ্রবেশকারী হঠানোর দাবি নিয়ে সরব হয়েছিলেন মমতা। স্পিকারের চেয়ারের দিকে নথিপত্র ছুঁড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু সেটা অতীত। আজকের মমতা মুসলমান ভোটের আশায় নাগরিকপঞ্জির বিরুদ্ধে। তাঁর বিশাল সংগঠন এই বর্তমানের প্রচারটাই করবে এবং করছে। সেখানে বিজেপির কর্মীবল অনেক অনেক পিছিয়ে। তাই কলোনি এলাকায় মমতার অতীতের নীতি কিংবা অমিত শাহর শিখিয়ে দেওয়া শরণার্থী ও অনুপ্রবেশকারীর মধ্যে পার্থক্য বোঝানোর মতো তৃণমূল স্তরের সংগঠন চাই। দিলীপবাবু এই কাজটা করতেই হবে। এটা বাংলার দাবি।

আগামী লোকসভা নির্বাচনের আগে তাই এই নাগরিকপঞ্জি ইস্যুকেই মোক্ষম অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে চায় তৃণমূল কংগ্রেস। এখন রাজ্য জুড়ে তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে চলছে সেই প্রচার। রক্তদান উৎসবেও ‘রক্তদান-মহৎদান’ নিয়ে দেড় মিনিট বলার পরেই নেতারা চলে যাচ্ছেন এন আর সি প্রসঙ্গে। আর তাতে স্পষ্ট ভয় দেখানো--- হিন্দু-মুসলমানের মতো বাঙাল-ঘটি বিভাজনও চাইছে বিজেপি।

নতুন ভোটারদের বড় অংশেরই দেশভাগের স্মৃতি নেই। তবে বড়দের মুখে গল্প শোনা ভয়ঙ্কর কষ্টের ছবি রয়েছে মনে। সেই ভয়টাই দেখাতে চাইছে তৃণমূল। আমাদের দিদির বুদ্ধির তারিফ না করে পারবেন না। পাল্টা বুদ্ধি দেখাতে পারবেন কি! দিদি মুসলমান ভোটের সবটা আর তার সঙ্গে বাঙাল ভোটের ভাগ দিতে চাইছেন।

পাল্টা জবাব মানে সত্যি কথা
বলা। কিন্তু বার বার বলা
মিথ্যার সামনে সত্যের
লড়াই কিন্তু বড় চ্যালেঞ্জ।

—সুন্দর মৌলিক

গান্ধী টুপি পরে থাকাদের তুলনায় স্যুট-বুট পরে থাকারা কি বেশি দুর্নীতিগ্রস্ত?

অতিথি কলম

স্বামীনাথন আয়ার

অতি সাম্প্রতিক একটি লোকসভা বিতর্কে কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধী বলেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী আদতে একটি 'স্যুট-বুটধারী' সরকার চালান, যাদের মূল লক্ষ্যই হচ্ছে বড়লোকেদের, কায়েমি স্বার্থবাজদের সাহায্য করা। এটা করতে গিয়ে তাঁরা গরিবদের স্বার্থ আদৌ দেখেন না। এর প্রত্যুত্তর দিয়েছেন মোদী লখনউয়ে ব্যবসায়ীদের একটি সম্মেলনে। তিনি সরাসরি ঘোষণা করেছেন যে, তাঁকে ব্যবসায়ীদের সান্নিধ্যে দেখা গেলে তিনি কখনই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন না। কংগ্রেস কিন্তু লুকিয়ে চুরিয়ে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে নোংরা লেনদেন করতে অভ্যস্ত। একটি জাতির সার্থক নির্মাণে ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, কৃষক, শ্রমিক, ব্যাঙ্ককর্মী বা সিভিল সার্জেন্টদের সমান যোগদান জরুরি। অসৎ ব্যক্তিদের তা সে সমাজের যে কোনও ক্ষেত্রেই হোক না কেন কড়া সাজা প্রাপ্য, কিন্তু তার মানে এই নয় যে কেউ খারাপ বলে সমগ্র শিল্পমহলকে একই কালো ব্রাশ দিয়ে মলিন করে দিতে হবে।

বাস্তবে ২০১৯-এর নির্বাচনী দামামা এখনই বেজে গেছে। ২০১৪-র নির্বাচনে মোদী কংগ্রেস নেতৃত্বের ইউপিএ জোটকে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। কংগ্রেস নামক দলটিকে একটি আদ্যন্ত দুর্নীতির পাঁকে ডুবে থাকা চোরেদের দল হিসেবে তিনি প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন। রাহুল গান্ধী এখন মোদীকে সেরকমই একটা কলঙ্কিত চরিত্র হিসেবে চিহ্নিত করার চেষ্টা করছেন। এটা ধোপে টিকবে?

সম্ভবত না। অনেকেরই মনে পড়বে সাদা কুর্তা ও গান্ধী টুপি এক সময় স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী নিঃস্বার্থ মানুষদের প্রতীক হয়ে উঠেছিল। তা কালক্রমে কুশাসন, জোচ্চুরি দুর্নীতির রূপক হয়ে ওঠে। বামপন্থীরা বা রাহুল যতই ছলনা করে বলুন না কেন যে, দেশের যাবতীয় দুর্নীতির দায় স্যুট-বুট পরা ব্যবসায়ীদেরই। এই সূত্রে ১৯৮৯ সালে রাজীব গান্ধী ও ২০১৪ সালে সোনিয়া গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেসের নির্মম পরাজয় এটাই প্রমাণ করে যে, ভোটারদের মনে বদ্ধমূল বিশ্বাস ছিল যে রাজনৈতিক পরিসরে সবচেয়ে বড় ধান্দাবাজ ছিল ওই খাদি কুর্তা ও গান্ধী টুপি ধারণ করা লোকগুলোই। ইউপিএ-এর দ্বিতীয় দফা— ২০০৯ থেকে ১৪ শুধুমাত্র ছিল আর্থিক কেলেঙ্কারির উপচে পড়া ভাঁড়ার। এরই প্রেক্ষিতে সমাজকর্মী আন্না হাজারের নেতৃত্বে গড়ে ওঠে এক বিশাল ও তীব্র দুর্নীতি বিরোধী আন্দোলন যা কংগ্রেসের ভাবমূর্তিতে শেষ পেরেকটি ঠুকে দেয়।

মোদীর জমানায় কিছু সন্দিগ্ধ চুক্তি ও দুর্নীতির অভিযোগ ইতিমধ্যে তোলা হয়েছে। কিন্তু ইউপিএ-এর সময় যা ঘটেছিল তার তুলনায় এগুলি ধর্তব্যে আসে না। নির্দিষ্ট পুঁজিপতিদের সুবিধে দেওয়া বা Cronyism যে উৎখাত হয়েছে তা নয়। হয়তো লড়াকু উড়োজাহাজ বা সাবমেরিন তৈরিতে যথোপযুক্ত অভিজ্ঞতা নেই এমন কোনো শিল্পপতিকে সেগুলি নির্মাণের বরাত দেওয়া হয়েছে বলে যদি অভিযোগ ওঠে তার সারবত্তা নিরীক্ষণ দাবি করে। কিন্তু সেই নির্দিষ্ট শিল্পপতিদের দৌরাত্ম্য বা Cronyism ইউপিএ-২-এর তুলনায় নাটকীয় ভাবে কমে এসেছে। শুধু তাই নয় স্বাধীনতার পর চার দশক ধরে কংগ্রেস শাসনে লাইসেন্স পারমিট রাজের যে রমরমা ছিল তা প্রায় খতম হয়ে গেছে।

কংগ্রেস সেই কালপর্বটিকে জওহরলাল নেহরু ও ইন্দিরা গান্ধীর মহান সমাজতান্ত্রিক অগ্রগতি বলে আজও সেই উত্তরাধিকারের অংশীদার হওয়ার গর্ব করে। বাস্তবে তখন স্বাধীন ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত নেওয়া বা বাজারে ব্যবসায়িক প্রতিদ্বন্দ্বিতার কোনো অস্তিত্বই ছিল না।

> পয়সাওলা, ক্ষমতাবান বিরাট শিল্পপতিদের এতদিনে তাঁদের নিজের শিল্পায়তন যা তাঁরা পরিচালনা করতে ব্যর্থ হয়েছেন সেখান থেকে অধিকারহীন করে দেওয়া হলো। কিন্তু তার মানে এই নয় যে দুর্নীতির সমাধি হলো বা Cronyism শেষ হয়ে গেল।

শিল্প স্থাপনের প্রতিটি অনুমোদন বা অস্তিত্বই লাইসেন্স দেওয়াকে অনুগ্রহ বা দয়া বলেই মনে করা হতো। আর সেই সিদ্ধান্ত হতো নিতান্তই রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। বাজারের প্রতিদ্বন্দ্বিতার যে নিয়মকানুন থাকে তার তোয়াক্কা করা হতো না। প্রত্যেকটি আমদানি ব্যবসার অনুমোদন, যে কোনো বিদেশি মুদ্রার আবণ্টন বা যে কোনো আবেদনের মঞ্জুরি বা পারমিট দেওয়ার অর্থই ছিল যে সেটি নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে অনুগ্রহ প্রদর্শন বা ইংরেজিতে যাকে বলে favour করা। লাইসেন্স পারমিট রাজের মাধ্যমে সংক্ষেপে বলতে গেলে এই অনুগ্রহ প্রদর্শনের সংস্কৃতিই ছিল Cronyism, এতে কোনো ভুল নেই। এক্ষেত্রে বরাত তারই মূলত যিনি এই লাইসেন্স যে কোনোভাবে জোটাতে পারতেন। সেখানে ওই ব্যবসায় বা শিল্প প্রচেষ্টায় যিনি সর্বাপেক্ষা পারদর্শী তাঁর জায়গা হতো না। লক্ষণীয় সেই সময় দেশে বহু রুগ্ন শিল্প ছিল কিন্তু কোনও রুগ্ন শিল্পপতি ছিলেন না। শিল্পদ্যো গের ব্যর্থতার জন্য তাঁদের কখনই দায়ী করা হতো না, কেননা দায়বদ্ধতার প্রশ্নই ছিল না। ব্যাঙ্কের তরফ থেকে বাড়তি টাকা দিয়ে বারবার তাঁদের শিল্পকে বাঁচাবার চেষ্টা করা হতো যতক্ষণ পর্যন্ত বাঁচাবার মতো কিছু টিকে থাকত। ব্যাঙ্ক থেকে নেওয়া যত বিশাল টাকাই তাঁরা শোধ করতে না পারুক, যত বড় অঙ্কের ঋণ-খেলাপিই হন না কেন নিজেদের কারবারের নিয়ন্ত্রণ তাঁদের কখনই হারাতে হতো না।

হ্যাঁ, নিশ্চিতভাবেই এই যথার্থ Cronyism-এর যুগান্ত হয়েছে। এটা ধাপে ধাপে হয়েছে সেই ১৯৯১ সালে অর্থনৈতিক সংস্কারের শুরুর পর থেকে। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নরসিংহ রাও এই উদার অর্থনীতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার রাস্তার পুরোধা ব্যক্তিত্ব ছিলেন। কিন্তু অনুতাপের বিষয় যেহেতু তিনি গান্ধী-নেহরু পরিবারের কেউ ছিলেন না তাই এমন একটা বিপ্লবাত্মক পরিবর্তনের সূচনা করা সত্ত্বেও কংগ্রেস তাঁকে কোনো বিশ্বাসযোগ্যতা বা কৃতিত্ব দেয়নি। ২০১১ সালে সরকারে থাকাকালীন অর্থনৈতিক সংস্কারের ২০ বছর বর্ষপুর্তির উদ্‌যাপনও দল বাতিল করে দেয়। শুরু করে

১২টি বিশাল ঋণখেলাপি শিল্পদ্যোগীর ফিক্সড অ্যাসেট যা আছে তা খুব শীঘ্রই নিলামে চড়বে বা ব্যবসা লিকিউডেশান (নিলয়)-এ যাবে।

নানা উপঢৌকনের রাজনীতি। চালু করে জনপ্রিয় মুফতে পাওয়ার কিছু প্রকল্প যার টাকা জোটাতে এই সুটেড বুটেড লোকজনদের কাছ থেকেই তারা টাকা আদায় করত। আজকে এদেরই তারা নির্লজ্জ সমালোচনা করছে।

হ্যাঁ, Cronyism (নির্দিষ্ট শিল্পপতি প্রীতি) নির্মূল হয়নি তবে মোদীর শাসনকালে তা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে এসেছে। সকলেই জানেন কোর্ট দ্ব্যর্থহীন ভাষায় নির্দেশ দিয়েছিল কয়লা ব্লক বা spectrum licence নিলামের মাধ্যমে বিতরিত হবে। কোনো রাজনৈতিক প্রিয়পাত্রকে নয়।

প্রধানমন্ত্রী একটি বিল পাশ করেছেন যার পরিণতিতে দেশের সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদ শুধুমাত্র সর্বোচ্চ নিলাম দরের মাধ্যমেই বিক্রি হবে। বেনামি সম্পত্তি ও রিয়েল এস্টেটের ক্ষেত্রে নতুন আইন লাগু হওয়ার ফলে কর ফাঁকি দেওয়া, ঘরবাড়ির ক্রেতাদের হয়রানি করা অনেক কমে এসেছে। বিমুদ্রীকরণের সময় যথেষ্ট ওলটপালট হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু এর প্রভাবে বহু লক্ষ নতুন করদাতা করজালে এসে গেছেন। তাঁরা নিয়মিত ট্যাক্স রিটার্ন দাখিল করছেন। দীর্ঘকাল ধরে আটকে থাকা জিএসটি এই সরকার তাগিদ করে পাশ করিয়েছে। বাণিজ্যিক কর ফাঁকি ও কালো টাকা ধরার ক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই এর প্রভাব টের পাওয়া যাচ্ছে। আয়কর আদায় বিপুল বৃদ্ধি পেয়েছে যার বড় অংশ দিচ্ছে কিন্তু ওই স্যুটেড বুটেডরাই।

এর পরও মোদী সরকারের সবচেয়ে বড় সংস্কার যা অর্থনীতি ক্ষেত্রে স্মরণীয় হয়ে থাকবে তা হলো 'Insolvency & Bankruptcy Code'। এই একটি মোক্ষম আইনের প্রয়োগে অসাধু, চোর যে সমস্ত শিল্পমালিক ব্যাঙ্কগুলি থেকে হাজার হাজার কোটি কোটি টাকা ঋণ খেলাপ করেছে তাদের কোম্পানির সম্পদ ভোগ করা বন্ধ করে এক কাপড়ে বার করে দেওয়া হয়েছে। কোম্পানি পরিচালনায় তাদের কোনো ভূমিকা নেই। আজন্ম শিল্পপতি বনে থাকা হোমরা-চোমরারা এখন ভারতের সুবৃহৎ সব শিল্পদ্যোগ থেকে বিতাড়িত হয়ে যাচ্ছে। উদাহরণ দিলে বোঝা যাবে, Essar-এর মতো বিশাল কোম্পানি তার অনুসারী কোম্পানি Essar Oil বিক্রি করে দিতে বাধ্য হয়েছে। কোম্পানিতে তাদের আর কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। Essar State-এর মতো অতিকায় ইস্পাত কোম্পানিও দেনার দায়ে তাদের হাতছাড়া হয়েছে। যারা শিল্প ব্যবসা বাণিজ্যের খবর রাখেন তারা জানাবেন যে শুধু টাটা, বিড়লা, গোয়েঙ্কা নয়, বিগত ৭০ বছরে আরও বহু শিল্পপতিই বাজারে এসেছেন। এদের মধ্যে Jaypee Group খুবই পরিচিত হয়ে উঠেছিল। এদের পরিচালনাধীন সিমেন্ট প্ল্যান্ট বিক্রি করে ব্যাঙ্কের দেনা মিটিয়েছে। ১২টি বিশাল ঋণখেলাপি শিল্পদ্যোগীর ফিক্সড অ্যাসেট যা আছে তা খুব শীঘ্রই নিলামে চড়বে বা ব্যবসা লিকিউডেশান (নিলয়)-এ যাবে। এদের পেছনে রয়েছে আরও কয়েক শতের লাইন।

বলতেই হবে এটিই আসল Cronyism-এর বিরুদ্ধে লড়াই যা এতকাল কেউ করেনি। পয়সাওলা, ক্ষমতাবান বিরাট শিল্পপতিদের এতদিনে তাঁদের নিজের শিল্পায়তন যা তাঁরা পরিচালনা করতে ব্যর্থ হয়েছেন সেখান থেকে অধিকারহীন করে দেওয়া হলো। কিন্তু তার মানে এই নয় যে দুর্নীতির সমাধি হলো বা Cronyism শেষ হয়ে গেল। কিন্তু সঠিক দিকে এক সুচিন্তিত পদক্ষেপ অবশ্যই নেওয়া হয়েছে। তা কিছুতেই অমান্য করা যাবে না। রাহুল গান্ধীর স্যুটেড বুটেডের খেলো বিদ্রূপে তার পথ পাল্টাবেও না।

(লেখক প্রখ্যাত স্তম্ভ লেখক ও অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞ)

রম্যরচনা

পূজো আসছে

শৈশবে বর্ষা ছিল, নিম্নচাপ ছিল না। ঝরো ঝরো দিনে স্কুল কামাই। এখনকার মতো গেম ছিল না। খেলা ছিল, তেমন খেলনা ছিল না। অগত্যা কাগজের নৌকা বানিয়ে বাড়ির সামনে তির তির করে বয়ে চলা বৃষ্টির জলে নৌকা ভাসানো। তার সাথে আমার শৈশব ভাসত। খিচুড়ি অবধারিত।

নিয়ম মেনেই এর পরে কাশফুল আসতো। আজও আসে। তবে অপু-দুর্গারা তার গায়ে আজ হাত বোলায় না। সামনে সেলফি, পেছনে কাশফুলের ভেলকি। সেই সময় স্কুলে এত রকস্টার, সেমিস্টার, প্রজেক্ট ছিল না। কেশব নাগ ছিল, পি কে দে সরকারের ইংরেজি ছিল।

বর্ষাতে কাঁথা মুড়ি ছিল। বেগুনি আর মুড়ি ছিল। ছপাৎ ছপাৎ জল দাপানো ছিল, টুনটুনির গল্প ছিল, এখনকার বিরল চড়ুই পাখি সরল ছিল, গল্পদাদুর আসর ছিল। মা, মাসির গলায় গান ছিল, পরিবারে প্রাণ ছিল, এল ই ডি আলোর বদলে শিউলি ফুলের আলো ছিল, ধক্‌ ছিল, রক ছিল, সব কিছুই ভালো ছিল। অভাব ছিল, তাকে ঢেকে দিত স্বল্প পাওয়ার সুখ। জ্যামিতির বাক্সকে কানে ধরে হ্যালো হ্যালো বলা ছিল, জীবনবোধের সহজ পথে চলা ছিল। কণিকার গান ছিল, পুজো আসার রব ছিল, থিম ছিল না, মা ছিল একচালাতেই। কুপন ছাড়াই প্রসাদ দিত। সব হারালাম, এগিয়ে গেলাম। হরেক রকম ফন্দি, জীবন এখন ভীষণভাবে মুঠোফোনে বন্দি।

উবাচ

❝ আমি নামদার নই মোটেই, আমি একজন কামদার। আমার আদর্শের পরিবর্তন হতে পারে না। আমি রুপোর চামচ মুখে নিয়ে জন্মাইনি। ❞

এক ইংরেজি দৈনিককে দেওয়া সাক্ষাৎকারে

নরেন্দ্র মোদী
ভারতের প্রধানমন্ত্রী

❝ সারাজীবন বাবাকে চুষে খেয়েছেন। দয়া করে এ বাড়িতে ঢুকবেন না। ❞

সোমনাথবাবুর মরদেহে শ্রদ্ধা জানাতে গেলে বিমান বসুকে প্রতাপবাবুর উক্তি

প্রতাপ চট্টোপাধ্যায়
সদ্য প্রয়াত সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র

❝ লোকসভার স্পিকার এবং এক দক্ষ সাংসদ হিসেবে সোমনাথ চ্যাটার্জির ভাষণ আগামী প্রজন্মের কাছে উল্লেখনীয়। ❞

সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে

হরিবংশনারায়ণ সিংহ
রাজ্যসভার উপাধ্যক্ষ

❝ চিঠির জবাব যাবে। কিন্তু তৃণমূল যদি ভাবে আমরা তাদের অগণতান্ত্রিক ও স্বৈরাচারী শাসন নিয়ে প্রশ্ন তোলা বন্ধ করে দেব, তাহলে সেটা ভুল হবে। ❞

অভিষেক ব্যানার্জি অমিত শাহকে আইনি চিঠি পাঠানোর হুমকি প্রসঙ্গে

রবিশঙ্কর প্রসাদ
কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্রী

❝ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কি কোনওদিন মতুয়া ও অন্য শরণার্থীদের নাগরিকত্বের জন্য আন্দোলন করেছেন! এখন বিজেপি সরকারই সেই দাবি পূরণে আইন করছে। ❞

দিলীপ ঘোষ
রাজ্য বিজেপি সভাপতি

অসমে এন আর সি নিয়ে মমতার রাজনীতি প্রসঙ্গে

অসম প্রত্যাখ্যান করেছে মমতাকে

রন্তিদেব সেনগুপ্ত

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঠিক কাদের স্বার্থরক্ষার রাজনীতি করেন? অসমের খসড়া নাগরিকপঞ্জি প্রকাশের পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে রাজনৈতিক আন্দোলন শুরু করেছেন— তার পরিপ্রেক্ষিতে জনমানসে এই প্রশ্নটি উঠে আসছেই। কিন্তু সেই প্রসঙ্গে প্রবেশ করার আগে বেআইনি অনুপ্রবেশকারী সম্পর্কে অতীতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকাটি কী ছিল— তা একটু জানা দরকার। ২০০৫ সালে কেন্দ্রে যখন কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ সরকার, সেই সময় এই অনুপ্রবেশ প্রসঙ্গেই লোকসভায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিক্ষোভ দেখান। সেই সময় মমতা ছিলেন এই রাজ্যের প্রধান বিরোধী নেত্রী। মমতার অভিযোগ ছিল, সিপিএম বেআইনি বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের নাম ভোটার তালিকায় তুলে দিয়ে নির্বাচনী ফায়দা লুটছে। এই বেআইনি বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিতকরণ করে তাদের বহিষ্কার করতে হবে— এই দাবিতেই মমতা লোকসভায় বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন। মমতার এই অভিযোগ এবং দাবি যে খুব অন্যায্য ছিল— একথা বলা যাবে না। এটা সত্য যে, নির্বাচনের স্বার্থে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশের সমস্যা সম্পর্কে সিপিএম সরকারে থাকার সময় একেবারেই চোখ কান বুজে ছিল। এবং একথাও সত্য, বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশির নাম এই রাজ্যের ভোটার তালিকায় প্রথম তুলেছিল সিপিএম। সিপিএম জমানার অবসানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এখন এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। ২০১৮ সালে ওই অনুপ্রবেশ সমস্যায় তাঁর কী দৃষ্টিভঙ্গি? বলতেই হচ্ছে, তাঁর সেই পুরনো অবস্থান থেকে ৩৬০ ডিগ্রি ঘুরে গিয়েছেন মমতা। ভোটের স্বার্থে অনুপ্রবেশকারীদের ব্যবহার করার যে রাজনীতি সিপিএম শিখিয়ে গিয়েছিল, সেই রাজনীতিই এখন মমতা পারদর্শিতার সঙ্গে করছেন। ২০১৮ সালে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মনপ্রাণ কাঁদছে অবৈধ অনুপ্রবেশকারী রোহিঙ্গা মুসলমানদের জন্য। বলতে গেলে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরোক্ষ প্রশ্রয়ে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার স্থানীয় স্তরের তৃণমূল নেতারা আশ্রয় শিবির বানিয়ে রোহিঙ্গা মুসলমানদের আশ্রয় দিয়েছেন। অসমের নাগরিকপঞ্জিকে কেন্দ্র করে মমতা যে আন্দোলন শুরু করেছেন, সেই আন্দোলনের নেপথ্যেও রয়েছে এই বাংলাদেশি মুসলমান অনুপ্রবেশকারীদের স্বার্থরক্ষা করা। উদ্দেশ্য একটাই— এই বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের ভোটের স্বার্থে ব্যবহার করা।

আর অনুপ্রবেশকারীদের স্বার্থরক্ষার রাজনীতিটি করতে গিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মিথ্যা প্রচার করে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছেন মানুষকে। অসমীয় বাঙালির মধ্যে দ্বন্দ্ব বাঁধিয়ে নিজের রাজনৈতিক ফায়দাটুকু লুটে নিতে চাইছেন। মমতা বলছেন, এই নাগরিকপঞ্জির ফলে অসম থেকে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সমস্ত বাঙালিকেই উচ্ছেদ করা হবে। কিন্তু সত্যই কি তাই? নাগরিকপঞ্জির উদ্দেশ্য কি সত্যই 'বঙ্গাল খেদা'? অসমের রাজনৈতিক-সামাজিক প্রেক্ষাপটটি যাঁরা জানেন, তাঁরা বুঝতে পারছেন 'বঙ্গাল খেদা'-র উদ্দেশ্য নিয়ে অসমের নাগরিক পঞ্জিকরণের কাজ হচ্ছে না। নাগরিক পঞ্জিকরণের একটিই উদ্দেশ্য— অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিতকরণ এবং তাদের ফেরত পাঠানো। অসমের সামাজিক- রাজনৈতিক ইতিহাসের দিকে যদি তাকানো যায়, তাহলে দেখা যাবে--- ১৯৪৭-এ দেশভাগ পর্ব থেকে যে দুটি রাজ্য শরণার্থী এবং অনুপ্রবেশ সমস্যায় জর্জরিত হয়েছে, তারা হলো অসম এবং পশ্চিমবঙ্গ। বিশেষ করে স্বাধীনতা-পরবর্তী সময় থেকেই অসমে অনুপ্রবেশ সমস্যা এমন ভয়াবহ সংকট রূপে দেখা দিতে থাকে যে, কেন্দ্রীয় সরকারও এ বিষয়ে চিন্তিত হয়ে ওঠে। অনুপ্রবেশের ফলে অসমের চারটি জেলায় সামাজিক ভারসাম্য দ্রুত বিনষ্ট হতে থাকে। অর্থনীতির ওপর চাপ পড়তে থাকে। শুধু তাই নয়, দেশের নিরাপত্তার পক্ষেও তা বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। কেমন বিপজ্জনক হয়ে উঠেছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৯৯৬ সালে অসমের যমুনামুখ বিধানসভা কেন্দ্রের নির্বাচনে। ওই নির্বাচনে অন্যতম প্রার্থী মহম্মদ কামালউদ্দিনের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে, তিনি আদৌ ভারতের নাগরিক নন। পাকিস্তানি নাগরিক। এবং পাকিস্তানের পাসপোর্টও তার কাছে রয়েছে। গুয়াহাটি হাইকোর্ট তার রায়ে বলে— 'কামালউদ্দিন ব্যক্তিটি পাকিস্তানি। তার পাকিস্তানি পাসপোর্ট আছে। সেই পাসপোর্ট নিয়েই তিনি

শান্ত অসমে উত্তেজনা ছড়িয়ে মমতা যে নিজের রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধি করতে চাইছেন তাও বুঝেছেন অসমের মানুষ। সে কারণেই অসমের সবকটি রাজনৈতিক পক্ষ এবং অসমের বাঙালি সংগঠনগুলিও মমতাকে নাগরিকপঞ্জি নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়াতে নিষেধ করছেন।

পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশে আসেন। পরে বাংলাদেশ থেকে চোরাপথে অবৈধভাবে ভারতে ঢোকেন। ভারতের বিভিন্ন জায়গায় ঘোরার পর অসমে এসে ঘাঁটি গাড়েন এবং অবশেষে এখানে নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামেন।' কামালউদ্দিনের ঘটনায় গুয়াহাটি হাইকোর্ট যথেষ্ট বিস্ময়ও প্রকাশ করেছিল।

অসমের অনুপ্রবেশ সমস্যার গুরুত্ব অনুধাবন করেই ১৯৫০-এ এবং ১৯৮৩-তে সংসদে শুধুমাত্র অসমের জন্য দুটি আইন পাশ করা হয়। ১৯৫০-এ 'দ্য ইমিগ্রান্টস অ্যাক্ট ১৯৫০' এবং ১৯৮৩-তে 'ইললিগাল মাইগ্রান্টস অ্যাক্ট ১৯৮৩' কার্যকর করা হয় অসমের অনুপ্রবেশ সমস্যার কথা মাথায় রেখেই। তাতেও অবশ্য অসমের অনুপ্রবেশ সমস্যা দূর করা যায়নি। তার বড়ো কারণ, কেন্দ্রের এবং অসমের কংগ্রেস সরকারের তোষণের রাজনীতি। তবে, এরই মধ্যে ১৯৯২ সালের এপ্রিল মাসে অসমের তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং কংগ্রেস নেতা হিতেশ্বর শাইকিয়া বলেন, অসমে ৩৩ লক্ষ বেআইনি অনুপ্রবেশকারী রয়েছে। তবে সব থেকে চমকপ্রদ তথ্যটি দিয়েছিলেন ২০০৪ সালে তৎকালীন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীপ্রকাশ জয়সওয়াল। ২০০৪ সালের ১৪ জুলাই রাজ্যসভায় শ্রীপ্রকাশ জয়সওয়াল জানিয়েছিলেন, ভারতে ১ কোটি ২০ লক্ষ ৫৩ হাজার ৯৫০ জন বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী রয়েছে। রাজ্যওয়াড়ি অনুপ্রবেশকারীর যে হিসাব দিয়েছিলেন শ্রীপ্রকাশ জয়সওয়াল তাতে দেখা গেছে, শুধু অসম আর পশ্চিমবঙ্গ মিলিয়েই অনুপ্রবেশকারীর সংখ্যা ১ কোটি। শ্রীপ্রকাশ জয়সওয়ালের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী ওই সময়ে অসমে অনুপ্রবেশকারীর সংখ্যা ছিল ৫০ লক্ষ আর পশ্চিমবঙ্গে ৫৭ লক্ষ। স্বাভাবিকভাবেই অনুমান করা যেতে পারে, গত কয়েক বছরে এই অনুপ্রবেশকারীর সংখ্যা বেড়েছে বই কমেনি। এই অনুপ্রবেশকারীদের শনাক্তকরণ এবং বহিষ্কারের দাবিতেই ৮০-র দশকে অসম গণপরিষদ (অগপ) এবং অল অসম স্টুডেন্টস ইউনিয়ন (আসু) আন্দোলন গড়ে তোলে। তারই ফলশ্রুতিতে ১৯৮৫ সালের আগস্টে অসম চুক্তি সম্পাদিত হয়। ওই চুক্তিতেই বলা হয়, ১৯৭১ সালের ২৪ মার্চের পর যারা এদেশে অবৈধ উপায়ে প্রবেশ করবে তাদের অনুপ্রবেশকারী হিসাবে চিহ্নিত করা হবে।

ইতিহাসের এই ঘটনাক্রমগুলি সম্ভবত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানেন না। জানেন না বলেই তিনি 'বঙ্গাল খেদা'-র জুজু দেখাচ্ছেন। অসমীয়-বাঙালি বিরোধ বাঁধাবার অসৎ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। অনুপ্রবেশকারীদের স্বার্থরক্ষার জন্য মানবিকতার ধুয়ো তুলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আন্দোলন করতে নেমেছেন। কিন্তু তাকে তো এটাও মানতে হবে— অনুপ্রবেশের দাপটে বিধ্বস্ত অসমের জনগণেরও অধিকার রয়েছে অনুপ্রবেশ মুক্ত সুস্থ সমাজজীবন ফিরে পাওয়ার। আর তাদের সেই অধিকার নিশ্চিন্ত করার দায়িত্ব রাষ্ট্রেরই। নাগরিক পঞ্জিকরণের ভিতর দিয়ে রাষ্ট্র সেই দায়িত্বটিই পালন করছে। নাগরিক পঞ্জিকে কেন্দ্র করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাঙালি প্রীতিটিও যে লোকদেখানো তাও ক্রমশ প্রকাশ হয়ে পড়ছে। খসড়া নাগরিকপঞ্জি থেকে প্রাথমিকভাবে বাদ যাওয়া ৪০ লক্ষ মানুষকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই রাজ্যে আশ্রয় দেবেন বলে জানিয়েছিলেন। অথচ এই রাজ্যের এক লক্ষের কিছু বেশি মানুষের পরিচয় যাচাই করার জন্য যখন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে পাঠিয়েছিল অসমের এন আর সি কর্তৃপক্ষ, তা যাচাই করে পাঠানোর কোনো তাগিদই বোধ করেনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। ফলে এই রাজ্যের মানুষ, অথচ অসমের বাসিন্দা এমন লক্ষাধিক মানুষের নামই ওঠেনি খসড়া নাগরিকপঞ্জিতে। মমতার এই ছদ্ম বাঙালি প্রেম আর দ্বিচারিতার রাজনীতি অসমের মানুষ বুঝে ফেলেছেন। শান্ত অসমে উত্তেজনা ছড়িয়ে মমতা যে নিজের রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধি করতে চাইছেন তাও বুঝেছেন অসমের মানুষ। সে কারণেই অসমের সবকটি রাজনৈতিক পক্ষ এবং অসমের বাঙালি সংগঠনগুলিও মমতাকে নাগরিকপঞ্জি নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়াতে নিষেধ করছেন। অসমের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং কংগ্রেস নেতা তরুণ গগৈ বলেছেন, 'অসম শান্ত আছে। নিজের স্বার্থে অসমকে যেন উত্তপ্ত করতে না আসেন মমতা।'

নাগরিকপঞ্জি নিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করার লক্ষ্যে মমতা বলছেন, বাংলাদেশ থেকে এসেছেন যে হিন্দু শরণার্থীরা, তাদেরও এই দেশ থেকে বহিষ্কার করা হবে। এই একই মিথ্যা প্রচার করে ২০১৪ সালের নির্বাচনের সময় এই রাজ্যে উদ্বাস্তু অধ্যুষিত কেন্দ্রগুলিতে ফায়দা লুটতে চেয়েছিলেন মমতা। সেই একই খেলা এবার নাগরিকপঞ্জিকে কেন্দ্র করে খেলছেন তিনি। অথচ, প্রধানমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে বারংবার বলা হয়েছে, হচ্ছেও, বাংলাদেশে থেকে আসা অত্যাচারিত এবং লাঞ্ছিত হিন্দুরা এদেশে শরণার্থীর মর্যাদা পাবে। ভারত তাদের আশ্রয় দেবে। তাদের কখনই বিতাড়ন করা হবে না। এ লক্ষ্যে একটি বিল সংসদের সাবজেক্ট কমিটির কাছে জমাও পড়েছে। মমতা এসবই জানেন। জেনে বুঝেও মিথ্যা বলছেন, বিভ্রান্ত করছেন মানুষকে। এসবই করছেন, নিজের রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির কারণে। রাষ্ট্রসঙ্ঘ শরণার্থী এবং অনুপ্রবেশকারীর যে সংজ্ঞা নিরূপণ করেছে— মমতা সযত্নে এড়িয়ে যাচ্ছেন তাও। রাষ্ট্রসঙ্ঘের সংজ্ঞায় পরিষ্কার বলা হয়েছে— কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী যদি নিজ দেশে সামাজিক, রাজনৈতিক বা ধর্মীয় কারণে অত্যাচারিত বা লাঞ্ছিত হয়ে অন্য দেশে আশ্রয় নেয়, তবে সেই ব্যক্তি বা গোষ্ঠী শরণার্থী হিসেবে বিবেচিত হবে। এই সংজ্ঞা অনুযায়ী বাংলাদেশ থেকে আগত অত্যাচারিত হিন্দু-বৌদ্ধরা শরণার্থী। আর অনুপ্রবেশকারী তারাই, যারা অন্য কোনো উদ্দেশ্য বেআইনিভাবে কোনো দেশে প্রবেশ করেছে। এই সংজ্ঞায় বাংলাদেশি মুসলমানরা অনুপ্রবেশকারী। এই সংজ্ঞা অনুযায়ীই বাংলাদেশি হিন্দুদের শরণার্থী মর্যাদা দিয়ে ভারত এখানে তাদের আশ্রয় দিচ্ছে। মমতা এই সত্যটাই আড়াল করতে চাইছেন।

অসমের মানুষ মমতার সারশূন্য রাজনীতি বুঝতে পেরেছেন। বুঝতে পেরেছেন বলেই, মমতার মুখের ওপর অসমের দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন। ▮

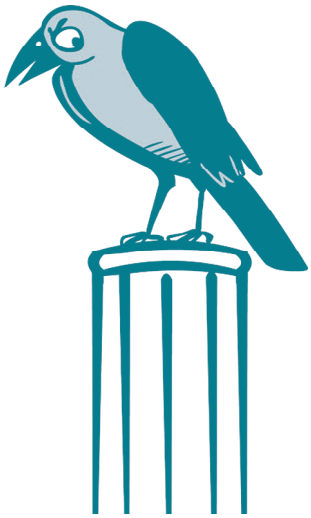

‘মানুষ নাই রে দেশে’

কবি একদা লিখেছিলেন, ‘প্রতিকারহীন, শক্তের অপরাধে বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে। আমি যে দেখিনু তরুণ বালক উন্মাদ হয়ে ছুটে কী যন্ত্রণায় মরেছে পাথরে নিষ্ফল মাথা কুটে।’ কথাগুলি যেন আজকে দেশজুড়ে ধর্ষিতা নারীর অসহায় আর্তনাদের নিষ্ফল মাথা কোটার সঙ্গে একেবারেই মিলে যায়। সংবাদপত্রের পাতা খুললেই চোখে পড়ে, দেশের উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিম জুড়ে চলছে এই পাশবিকতার অবাধ প্রেতনৃত্য। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, মানবাধিকারের এই নগ্ন ধর্ষণে সরকার, সমাজ, বিচারব্যবস্থা, গণসংগঠন, উচ্চকিত নারীবাদ, এমনকী হিউম্যান রাইটস সংস্থার সাধু বাক্যের ব্যর্থ পরিহাস ছাড়া যেন কারোর কোনও কার্যকরী ভূমিকা নেই।

আশ্চর্যের বিষয়, প্রগতিশীলতার বুলি কাপচানো একটা একশো কোটি লোকের তথাকথিত সভ্যসমাজে এই অসভ্যতার পরাকাষ্ঠার নগ্ন বাস্তবে কারোর মধ্যেই তেমন বিচলিত হওয়ার চিহ্ন চোখে পড়ে না। মনুষ্যত্বের দাবিতে নারীর বাঁচার অধিকারের এই অবাধ লঙ্ঘনে কিন্তু মৃদু মৌখিকতা ছাড়া, সমাজের কোনও স্তরে কোনও তাপ-উত্তাপ নেই। মানবাধিকার রক্ষার নাম করে যে প্রতিষ্ঠানগুলি ধর্ষকের প্রাণদণ্ডে মায়াকান্নার বন্যায় আকাশ বাতাস মুখরিত করে তোলে, তারা ধর্ষণের ঘটনায় যেন শীতের সরীসৃপের মতো অন্ধকার বিবরে আশ্রয় গ্রহণ করে। আর নারীর অধিকার রক্ষায় উচ্চকিত বামাবোধিনীর দল, বাহুল্যবর্জিত বেশে দিগম্বরী হওয়ার সাধনায় শোভাযাত্রা করতে যতখানি তৎপর, নারীর প্রতি এই ঘৃণ্য অপরাধের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে ততখানিই নীরব। ভাগ্যের করুণ পরিহাস আর কাকে বলে!

অথচ সর্বস্তরের নিষ্ক্রিয় সহযোগিতায়, এই নারকীয় অনাচার আজ এমন সুবিস্তৃত হয়েছে যে, তথ্যসূত্রে জানা যায়, ভারতে প্রতি ছঘণ্টায় নাকি একজন করে বকরাক্ষসের কবলে পড়ে ধর্ষিতা হচ্ছে। ক্রাইম রেকর্ডের তথ্য অনুযায়ী, গত ২০১৬ সালে ৩৮ হাজার ৯৪৭ টি ধর্ষণের মামলা নথিভুক্ত। এবং এই ক্রমবর্ধমান অপরাধের কোনও স্থান, কাল, পাত্র নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বর থেকে অফিস, ইস্কুল, ঘাট,মাঠ, বাট, বাস, রেল যে কোনও খোলা এবং বন্ধ জায়গায়, এই ধর্ষণ কাণ্ড অবাধে চলছে। এখন আবার দিকে দিকে সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত নারী সুরক্ষা আশ্রমগুলি কার্যত নারীধর্ষণ কেন্দ্রে পরিণত। যেমন এখন বিহারের মজঃফরপুরে ও উত্তরপ্রদেশের দেওরিয়াতে দেখা যাচ্ছে।

পুলিশের সজ্ঞান দীর্ঘসূত্রিতা, আইনের লম্বা হাত এবং সরকারের নতুন নতুন আইন প্রণয়নের মধ্যে দিয়েই, অপরাধের বিরুদ্ধে বালির বাঁধ নির্মাণ করার চেষ্টাটা চোরাবালিতে গিয়ে সমাধিলাভ করে। সরকার থেকে সমাজ, সর্বক্ষেত্রে এই অপরাধের বিরুদ্ধে সক্রিয়তার অভাবই এটিকে সমাজদণ্ডের এক দুরারোগ্য ক্যান্সারে পরিণত করেছে।

অনতি-অতীতে, নারীর নিরাপত্তার অভাবের বিষয়ে ভারতের বিরুদ্ধে দোষারোপ করে, বিদেশি থমসন-রয়টার্স-ফাউন্ডেশন এক রিপোর্ট প্রকাশ করায় দেশে তুমুল সমালোচনার ঝড় উঠেছিল। রিপোর্টের মধ্যে তথ্যের সত্যতা থাকলেও বিশ্বের প্রেক্ষিতে তুলনামূলক বিচারে, ইউরোপ আমেরিকার মতো উন্নত দেশে এই অপরাধের হার অনেক অনেক বেশি। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় সুইডেনের মতো মুক্ত যৌনতার দেশে অবিশ্বাস্যভাবে ধর্ষণের উচ্চহার। ইউরোপ আমেরিকায় ধর্ষণের হার আমাদের থেকে অনেক ওপরে বলে আমাদের সান্ত্বনা পাওয়ার কোনও অবকাশ নেই। যদুও করেছে স্যর, বলে মধুর পার পাওয়ার উপায় নেই।

তবে শিক্ষণীয় এই যে সুইডেনের মতো অবাধ ও মুক্ত যৌনলীলার সমাজ ব্যবস্থা যখন এই অপরাধকে সংযত করতে পারেনি, তখন আমাদের মতো রক্ষণশীল ও পাশ্চাত্য প্রভাবিত জীবনাচরণের মিশ্র ব্যবস্থায় সাবধান হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে। আমেরিকার স্কুলে সকলের সামনে বেপরোয়া গুলি চালিয়ে নরহত্যা করার ঘটনা ঘটলে, সেটা কোনও আদর্শ হতে পারে না। বরং আমাদের দেশে এখনও যে সেই প্রগতিশীল সভ্যতা এসে হাজির হয়নি, সেটাই রক্ষে, তবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দেশে ধর্ষণ আগে দুর্লক্ষ্য হলেও, এখন সেটির ঘটনাতে আশঙ্কার কারণ আছে এবং তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণেরও অবশ্য প্রয়োজন।

আসলে যে কোনও অপরাধ দমন নির্ভর করে, নির্ভরযোগ্য রোগ প্রতিরোধ তথা প্রতিষেধকের ব্যবস্থা করার উপর। যে কোনও অপরাধ দমনের প্রথম কথা হলো, Crime doesn’t pay কথাটিকে প্রত্যক্ষ বাস্তব করে তোলা। প্রশাসন বা বিচারব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে, আইনের ফাঁক দিয়ে যদি দোষী শাস্তি থেকে অব্যাহতি পায় তাহলে তার ফল মারাত্মক হতে বাধ্য। আমাদের দেশে বিধান আছে, শত অপরাধী ছাড়া পাক, কিন্তু একটিও নিরপরাধ যেন শাস্তি না পায়। ফলে সংশয়ের সেই সুযোগ, benefit of the doubt-এর কল্যাণে শত অপরাধী ছাড়া পেয়ে যাচ্ছে। তার পরিবর্তে রাজনৈতিক প্রশাসনের শত্রুনিধন কৌশলে নিরপরাধরা জেলে পচছে।

ধর্ষণের ক্ষেত্রেও পুলিশি নিষ্ক্রিয়তায় বা যোগসাজসে ধর্ষণের প্রায় ক্ষেত্রেই অপরাধী ছাড়া পেয়ে আবার ত্রাস হয়ে উঠছে। আদালতে কাজির বিচারে ধর্ষককে বলা হচ্ছে ধর্ষিতাকে বিয়ে করতে। এ কেমন বিচারবুদ্ধি যে, ধর্ষককে বিবাহের অনুমতি দেওয়া,

নিরবচ্ছিন্নভাবে সারাজীবন ধর্ষণ করার। সরকার, প্রশাসন, বিচারবিভাগ ও জনমত যদি অপরাধ দমনে সক্রিয় না হয়, তাহলে সব আস্ফালনই অরণ্যে রোদন হতে বাধ্য।

ধর্ষণের প্রতি সরকারি মনোভাব হলো তাকে কীভাবে ধামাচাপা দেওয়া যায় এবং অভিযুক্তরা ছাড়া পেয়ে যায়। আমাদের পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থী আমলে তো, ধর্ষণের অধিকার সংগ্রামের হাতিয়াররূপে লাগামছাড়া হয়েছিল। পরিবর্তনের জমানায়, পার্ক স্ট্রিট ধর্ষণকাণ্ডে, চোরের মায়ের বড়ো গলা করে, স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী বললেন, এটি একটি ষড়যন্ত্র। কিন্তু তাঁর মিথ্যা ভাষণের থোঁতা মুখ ভোঁতা করে দিয়ে তদন্তকারী পুলিশ অফিসার ঘটনার সত্যতা স্বীকার করলেন।

তার পরে দিনের আলোর মতো স্পষ্ট কামদুনি ধর্ষণ কাণ্ডেও অনেক জল ঘোলার পরও, পরিচিত ধর্ষণকারীরা যে কোথায় বসে মজা করছে তা আজও অজানা। এবার রানাঘাটের চার্চে দুষ্কৃতী তাণ্ডবে সত্তর বছরের বৃদ্ধা নানের ন্যক্কারজনক ধর্ষণে যখন ইস্কুলের সুকুমারমতি বালিকারা শান্তিপূর্ণ মোমবাতি মিছিল করে তখন মহীয়সী মুখ্যমন্ত্রী তাদের ধমকে সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করেন।

দিল্লিতেও ২০১২ সালে যখন চলন্ত বাসে নির্ভয়া কাণ্ডের গণধর্ষণের বীভৎসতায় দেশজুড়ে ধিক্কার আরম্ভ হয়, তখন দেশের সুপার প্রধানমন্ত্রী একজন মহিলা। কিন্তু ভারত প্রমাণ করেছে, মহিলা শাসন ক্ষমতায় থাকলেই যে মহিলারা ধর্ষণের সুবিচার পাবে, তা কিন্তু নয়। কী দিল্লিতে আর কী কলকাতায়। দিল্লিতে নির্ভয়া কাণ্ডে স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভের ব্যাপকতাকে দমন করার জন্যে সরকার নির্লজ্জভাবে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে কোনওরকম যোগাযোগের চেষ্টা না করে সেই ডিসেম্বরের শীতার্ত রাতে রায়ট পুলিশ দিয়ে জলকামান ব্যবহার করে বিক্ষোভকে ছত্রভঙ্গ করার চেষ্টা করে।

এরকম ক্ষেত্রে প্রথমেই সজ্ঞান পুলিশি নিষ্ক্রিয়তায় সাক্ষ্যপ্রমাণ লোপ এবং পরে চার্জশিটে বড়ো বড়ো ফাঁক রাখার ফলে বিচারালয়ে অপরাধী খালাস পেয়ে যায়। দিল্লিতে জেসিকা লালের প্রকাশ্য হত্যার ক্ষেত্রে একই ব্যাপার ঘটেছিল, তবে জনবিক্ষোভে কেসটি পুনর্বিবেচনার জন্য গৃহীত হয়। 'নির্ভয়া' কাণ্ড ঘটার পরে চারিদিকে শোক ও সহানুভূতির ঢেউ বয়ে যায়। এমনকী হিন্দি ছবির বাদশাহ উক্তি করেন, পুরুষ হিসেবে তাঁর লজ্জা হচ্ছে।' আহা ঢপের কথা শুনলে মরে যাই মরে যাই আর কী!

জলকামান ব্যবহারের দক্ষতা ছাড়া, পুলিশি অপদার্থতা সত্ত্বেও, এই হাতে নাতে ধরা পড়া অভিযুক্তদের সূক্ষ্মবিচার করতে আইনের লম্বা হাতের প্রায় সাড়ে চার বছরের অধিক কালক্ষেপ হয়। সজ্ঞানচর্চিত বিচারব্যবস্থার শম্বুক গতি, অপরাধীদের পরিত্রাণের পথ প্রশস্ত করে। Justice delayed, Justice denied কথাটা অভ্রান্ত সত্য হলেও আমাদের এই শ্লথগতি বিচার ব্যবস্থাকে ত্বরান্বিত করার জন্যে, কোনও প্রয়াস নেই।

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, ২০১২ সালে একমাত্র নির্ভয়া মামলা ছাড়া যে ৭০৬ টি ধর্ষণ মামলা দিল্লিতে দাখিল করা হয় তার কোনওটি ফয়সালার মুখ দেখেনি। এই ব্যবস্থার সংশোধনে, কারোর ভ্রূক্ষেপ নেই। এই ব্যাপারে, না মহামান্য সরকারের না মহামতি বিচারকদের কোন উদ্যোগ চোখে পড়ে না। যেখানে মামলার পাহাড় জমে আছে, সেখানে কোন লজ্জায় যে বিচারকরা ইস্কুলের মতো প্রতি বছর Summer Vacation এ যান, তা দুর্বোধ্য। আগে না হয় প্রচণ্ড গরমে উত্তপ্ত আদালতে কোট-প্যান্ট পরে কাজের অসুবিধে ছিল, কিন্তু এখন শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে মাথা ঠাণ্ডা রেখে কাজ করার কী অসুবিধে তা কে জানে।

আর সরকার আছে খালি আইন প্রণয়ন করতে। সংসদ যেমন হয়েছে এখন, অশিক্ষিত, ক্রিমিনাল ধারায় চার্জশিটপ্রাপ্ত, বাহুবলী সম্প্রদায়ের আখড়াবিশেষ, আইনপ্রণয়নও সেই পথ ধরে চলে। হঠাৎ বধূহত্যা, বধূ অত্যাচার রোধ করতে ৪৯৮ ধারায় উজবুকের আইন হলো, অভিযোগ হলেও কোনও কথা নয়, আগে শ্বশুরবাড়ির লোককে জেলে পোরো। পরে বুদ্ধির উদয় হতে তাতে এখন একটু ছাড় হয়েছে। আবার দলিতদের ক্ষেত্রে অভিযুক্তের স্বাধিকার রক্ষার জন্য যখন আদালত বিশেষ ব্যবস্থার কথা বলে, তখন সেটা খারিজ করতে আইন প্রণয়ন করা হয়। এদিকে মজঃফরপুর ও দেওরিয়াতে সরকারি পয়সায় চলা Women's Home-এর সেক্স র‍্যাকেট অবাধে চলতে পারে।

তবু ভালো, মজঃফরপুরের ঘটনায় সুপ্রিম কোর্ট নড়ে চড়ে বসে নারী আশ্রমে ধর্ষণের বাস্তবতা নিয়ে সরব হয়েছে। কিন্তু আইনি কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের কোনও দিশার কিন্তু উল্লেখ হয়নি। ধর্ষণের মামলার জন্যে অবশ্য প্রয়োজন একটি ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট গঠনের। হাই কোর্ট বা সুপ্রিম কোর্টে বিচারপতির অপ্রতুলতা থাকায়, অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিরা, অন্তত সত্তর বছর বয়স অবধি, রাজ্যে ও সুপ্রিম কোর্টে এই ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টের বিচারের ভারপ্রাপ্ত হতে পারেন। বিচারপতি লিবারহ্যানের মতো আঠারো বছর ধরে বিচারের প্রহসনের কোনও সুযোগ থাকবে না। নির্যাতিতা স্বয়ং বা তার পক্ষে আবেদন নিয়ে আদালতে অভিযোগ করলে, সঙ্গে সঙ্গে সাক্ষ্যপ্রমাণসহ বিচারে সাব্যস্ত করতে হবে অভিযোগের সত্যতা। অভিযোগ সত্য প্রমাণিত হলে ধর্ষণ ও হত্যার জন্য ফাঁসি ও ধর্ষণ ও গণধর্ষণের জন্য দীর্ঘমেয়াদি সশ্রম কারাদণ্ড।

তবে এই ব্যাপারে সরকারের তরফ থেকে সব দিক থেকে সহযোগিতা একান্ত বাঞ্ছনীয়। প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন একবার অটলবিহারী বাজপেয়ী বলেছিলেন, তাঁর ধর্ষণের শাস্তি মওত হো যায়। ধর্ষণের কোনও ঘটনাকে, পার্টিবাজি বা রাজনীতি করার অজুহাতে যেন ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা না হয়। নতুন নতুন আইন প্রণয়নের বাহানা না করে, প্রচলিত আইন সক্রিয়ভাবে বলবৎ করাটাই অনেক বেশি ফলপ্রসূ। নির্ভয়া কাণ্ডের পর ২০১৩ সালে যে নির্ভয়া ফান্ডের জন্য প্রতি বছর ১০০০ কোটি টাকার বরাদ্দ আছে, তা অব্যবহৃত হয়ে পড়ে থাকে। সেই টাকার যথাযথ ব্যবহারে, নারীর সুরক্ষা তথা ধর্ষণের শিকারের সামাজিক পুনর্বাসনের কাজে লাগানো যেতে পারে। তবে ধর্ষণ প্রতিরোধে সামাজিক ও নাগরিক আন্দোলনের বিশেষ প্রয়োজন।

বাহুবলী রাজনীতির প্রতাপে সমাজে মূল্যবোধের অববয়ে নাগরিক অধিকারের বিপন্নতায় ও নারীর অবাধ ধর্ষণের বাস্তবতায়, সেই কবি মুকুন্দ দাসের কথায় মনে হয়, 'মানুষ নাই রে দেশে'।

■

বর্তমান থেকে ভবিষ্যতের পথে সোশ্যাল-ডিজিটাল ভারত

অনিন্দ্য বন্দ্যোপাধ্যায়

মানস রাম ভার্মার একটা টুইটেই নড়ে চড়ে বসল প্রশাসন। রাজ্য সমবায় মন্ত্রীর শশব্যস্ত দৌড়াদৌড়ি। কেন্দ্রের কড়া নজর ও পরিদর্শনের পর ব্যবস্থাও নেওয়া হলো তড়িঘড়ি। সমবায় বিভাগে চালু হলো সকাল ৮টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত টোল ফ্রি কল সেন্টার। আর এতেই ''গত বছরের সাড়ে তিন লাখ মেট্রিকটন থেকে বেড়ে এবছর এখনও পর্যন্ত সাড়ে চোদ্দ লাখ মেট্রিকটন গম বিক্রি হয়েছে চাষিভাইদের, আর তা বেড়েই চলেছে''--- জানালেন উত্তরপ্রদেশের সমবায় মন্ত্রী মুকুট বিহারী ভার্মা। এতক্ষণে ভাবছেন নিশ্চয়ই টুইটটি হোমরা চোমরা কোনও প্রভাবশালীর। তবে নামটা ঠিক চেনা ঠেকছে না কিনা! এই মানস রাম ভার্মা হলেন উত্তর প্রদেশের প্রত্যন্ত গ্রামের এক গম-চাষি। কোঅপারেটিভে গম বিক্রি করতে কিছু সমস্যা দেখা দেওয়ায় সে টুইট করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে। আর ব্যাস, তাতেই সমাধান। এই হলো ডিজিটাল ভারতের সোশ্যাল মিডিয়ার কেরামতি। কৃষকের হিসাবের কড়ি সরাসরি ব্যাংকে, তাও ডিজিটালি ক্যাশলেস।

প্রধানমন্ত্রী দেশের বিভিন্ন প্রান্তে থাকা মানুষকে ডিজিটাল ভারতের কর্মসূচির সাফল্য তুলে ধরে বলেছেন যে, সাধারণ নাগরিকদের আরও বেশি কারিগরি সচেতন হতে হবে। তাঁর বিশ্বাস, ''আমরা খুব সহজেই ডিজিটাল ভারতে, প্রযুক্তির হাত ধরে, বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকায় সমস্যার সমাধান করে ফেলতে পারি।''

রেলের টিকেটের অনলাইনে বুকিং বলুন, কিংবা কোনও বিলের টাকা জমা দেওয়া— সবই চলতে পারে অনলাইনে... আর এটি বেশ সুবিধাজনকও বটে। এটা খেয়াল করা উচিত যে, প্রযুক্তির সুবিধা একটি নির্দিষ্ট গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ নয়, সমাজের সকলেই এর হকদার। দেশে কমন সার্ভিস সেন্টার (https://csc.gov.in/)-এর নেটওয়ার্ক শক্তিশালী হয়েছে। সঙ্গে

ডিজিটাল পেমেন্টের (https://www.npci.org.in) এই ব্যাপক আন্দোলন— দালালরাজকে সম্পূর্ণ নির্মূল করার লক্ষ্যে একটা অব্যর্থ পদক্ষেপ।

কমন সার্ভিস সেন্টারগুলি (সিএসসি) দেশের জনসাধারণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিষেবা, সামাজিক কল্যাণ প্রকল্প, স্বাস্থ্যসেবা, আর্থিক, শিক্ষা ও কৃষি সেবা দেওয়ার অ্যাক্সেস পয়েন্ট বা সহায়তা কেন্দ্র। এটা একটা দেশ-জোড়া (প্যান-ইন্ডিয়া) নেটওয়ার্ক যার অবস্থান দেশের সমস্ত আঞ্চলিক, ভৌগোলিক, ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের মধ্যেই ছড়িয়ে। এইভাবে একটা সামাজিক, আর্থিক ও ডিজিটাল পরিকাঠামো সমাজ আর সরকারকে আরও তাকতদার হয়ে উঠতে সাহায্য করছে।

ডিজিটাল ভারতের কারণে, তথ্য প্রযুক্তি ক্ষেত্রে ভোলবদল হচ্ছে। এর আগেও বড়ো বড়ো শহর ছিল বটে, কিন্তু তথ্য প্রযুক্তি সম্পর্কিত সুযোগ এখন সেখানে অনেক বেশি। যমুনা নগর থেকে মিসবাহ হাশমি প্রধানমন্ত্রীকে টুইট বার্তায় বলেন যে, সিএসসি ব্যবহার করে ব্যাঙ্কিং, বিমা এবং পেনশন বিষয়ক বিভিন্ন বিষয়ে সরকারি এবং অন্যান্য পরিষেবার তাঁরা প্রতিনিয়তই সুযোগ নিচ্ছেন। চিকিৎসার জন্যে, ডাক্তার হাজির হচ্ছেন সোশ্যাল মিডিয়ার ভিডিও কলে।

উত্তরপ্রদেশের গৌতম বুদ্ধ নগরের জিতেন্দর সোলাঙ্কি বলেন, ''আমার এখন ১৫টি কম্পিউটার। গত তিন বছরে এই সাফল্য এসেছে। আর ডিজিটাল ভারতের কল্যাণে, গ্রামে ইন্টারনেট আজ যথেষ্টই দ্রুতগতির। ফলে শিশুদের অনলাইন কোচিংয়ের সুবিধা এখন হাতের নাগালেই। আমার গ্রাম তাই ডিজিটাল গ্রাম।''

ডিজিটাল প্রযুক্তি ভারতকে একটি উন্নয়নশীল দেশ থেকে সুপার পাওয়ারে রূপান্তরিত করছে। ডিজিটালাইজেশনের ফলে ভারত তার বিশাল অর্থনৈতিক সম্ভাবনাকে উপলব্ধি করেছে, আর সমাজও সেই তালে পা বাড়িয়েছে। ভারতের টেলিকম, ব্রডব্যান্ড, কম্পিউটার এবং সফটওয়্যারের ক্রমবিবর্তন দীর্ঘপথ বেয়ে এখন উন্মুক্ত ও উন্নত। সরকারি এবং বেসরকারি যৌথ প্রয়াসে ডিজিটাল পরিকাঠামো সকলের জন্য সুলভও হয়েছে।

ডিজিটাল আইডি (https://

www.uidai.gov.in) এবং আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহারে ভারত আজ অগ্রণীর ভূমিকায়। ভারতের ডিজিটাল নেতৃত্ব বাকি বিশ্বের জন্য রোলমডেল, বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলির ক্ষেত্রে। আর অন্য দেশকে সহায়তা করতে ভারত পিছপা নয় মোটেই। কতকগুলো সিস্টেম বিশেষ উল্লেখযোগ্য, যেমন 'আধার' এক অনবদ্য ডিজিটাল আইডি প্ল্যাটফর্ম। ইতিমধ্যে কোটি কোটি ভারতীয় এই আধার-এর আওতায়।

ভারত স্ট্যাক (http://indiastack.org.) হলো এমন একটা সফটওয়্যার প্ল্যাটফর্ম যা ইন্টারফেস, বিভিন্ন সফটওয়্যার অ্যাপ্লিকেশন বা ওয়েব পরিষেবা পেতে সাহায্য করে। কাগজপত্র ছাড়াই কিছু প্রমাণ করার জন্য আধার এবং ভারত স্ট্যাক-এর যুগলবন্দি ডিজিটাল লেনদেনের দ্রুত বিস্তারে সাহায্য করেছে। আর সেই সঙ্গে আছে ডিজিটাল সিগনেচারের অনুমোদন ও ইউনিফর্ম পেমেন্ট ইন্টারফেস (ইউপিআই)। ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলা বা ডিজিটাল পেমেন্ট গ্রহণ- প্রেরণ, যে কোনও কাজ হচ্ছে অবিলম্বে। এছাড়া গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র (ডকুমেন্ট) সংরক্ষণ, পুনরুদ্ধার এবং ফরোয়ার্ড করার জন্য রয়েছে ডিজিটাল লকার নামে একটি প্ল্যাটফর্ম। এর ব্যবহারে কেওয়াইসি-র (আপনার গ্রাহককে জানুন) খরচ কমেছে, আর তাতে মানি লন্ডারিং-এর মতো অপরাধমূলক আর্থিক ক্রিয়াকলাপের বিরুদ্ধে সুরক্ষা আরও জোরদার হয়েছে। এই পদ্ধতিতে ব্যক্তি, ব্যবসা এবং সরকারের মধ্যে আর্থিক সংযোগ হয়েছে সহজতর, কমেছে কাগজপত্রের ঝঞ্ঝাট।

ভারতীয় মডেল বাকি বিশ্বের ওপর, বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলির ওপর প্রভাব ফেলেছে। এই দেশগুলো কীভাবে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে প্রতিষ্ঠানের গঠন ও সুপরিচালনার দিকে অগ্রসর হতে পারে তা শিখতে চাইছে ভারতের কাছ থেকে। কারণ অন্যের ডিজিটাল পরিকাঠামো গড়ে তুলতে চীনের নেতিবাচক মানসিকতা ভারতকে অন্যদের কাছে আরও গ্রহণীয় করে তুলেছে। অনেক উন্নয়নশীল দেশই ভারতীয় ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম এবং পদ্ধতির স্বাদ নিতে আগ্রহী। ভারতের পুঁজি-বিনিয়োগ, পরিকাঠামোর নকশা, অর্থ, পরিচালন এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা তাদের আগ্রহী করে তুলেছে। এরা ভারত থেকে শিখতে চায় বায়োমেট্রিক পরিচয় ব্যবস্থার প্রয়োগও। প্রযুক্তিগত নেতৃত্বের এ এক বেনজির নিদর্শন। তিনটি বিষয়ে ফোকাস করে টাস্ক ফোর্স নিয়োগ করা দরকার। প্রথমত, এই ডিজিটাল পরিকাঠামো উন্নয়নশীল দেশের বৈদেশিক সহায়তার এক অবিচ্ছেদ্য অংশ— যা দেশ ও রাজ্যের অগ্রগতির জন্য প্রণয়ন করা আবশ্যক। দ্বিতীয়ত, এটি বাইরের দেশের জন্য 'ওয়ান স্টপ শপিং' ব্যবস্থা যা তাদের ভারতের দরজায় এনে দাঁড় করাবে। তৃতীয়ত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সিঙ্গাপুর এবং ইজরায়েল যেমন ডিজিটাল ক্ষমতাশালী, আন্তর্জাতিকভাবে তেমনি হয়ে উঠবে আমাদের টাস্ক ফোর্স।

ডিজিটাল ভারত কিন্তু মাটিতে পা রেখেই আকাশকে ছোঁয়ার চেষ্টা। চার সন্তানের বাবা আহমেদ পাশা হায়দরাবাদের নিকটবর্তী মুসারামবাগের এক কলা বিক্রেতা। পারিবারিক চাপে স্কুলের পথে পা-ই বাড়াননি কোনোদিন। কিন্তু আজ দেশের ডিজিটাল বিপ্লবে যোগদান করেছেন। ১৮ বছর ধরে দিলশুখনগর বাস ডিপোতে ঠেলা গাড়িতে কলা বিক্রি করা, বছর চৌত্রিশের আহমেদ হঠাৎই কোথাপেট ফলের বাজারে একটা আলাদা মাত্রা যোগ করেছেন। ওঁর কাছে ডজন খানেক কলা কিনলেও দাম কিন্তু অনলাইনেই মেটাতে পারবেন। তাঁর ঠেলা গাড়ির একটি ডিসপ্লে বোর্ড খরিদ্দারকে আকর্ষণ করে। পাশা বলেন, ''বেশ কয়েকজন গ্রাহক নগদহীন লেনদেন চাইছিলেন। আমিও বুঝতে পারছিলাম যে নগদের ব্যবহারে তোরা অনিচ্ছুক, আমি তাদের upi অনলাইনের সুবিধা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম।''

ডিজিটাল ভারতের প্রচারাভিযানের অধীনে গ্রামবাসীদের ডিজিটাল শিক্ষায় উৎসাহিত করতে ঝাড়খণ্ডের পূর্ব সিংভূম থেকে প্রায় ২৩ কিলোমিটার দূরে হীরাচুনি গ্রামের উদ্যোগ প্রশংসার দাবি রাখে। ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী, সেখানে পুরুষদের মধ্যে স্বাক্ষরতার হার ছিল বেশি। প্রাথমিকভাবে জামশেদপুর ব্লকের অধীনে ন্যাশনাল হাইওয়ে ৩৩-এর উপকণ্ঠে ছোট্ট এই গ্রামকে চিহ্নিত করা হয়। তারপর এক রবিবার সেই গ্রামে পৌঁছে যান স্থানীয় জনসংযোগ অধিকর্তা। বর্তমান ও প্রাক্তন গ্রামপঞ্চায়েত প্রধান-সহ গ্রামবাসীদের সঙ্গে বৈঠক করেন। কথা হয় যুবক আর প্রবীণদের সঙ্গেও। গ্রামের ৬০টি বাড়িতে কমবেশি ৩০০ জনের বসবাস, আর তাদের অধিকাংশই এখন ইন্টারনেটে সংযুক্ত। প্রতিটি পরিবারের জন্য তৈরি হয় একটি করে ডিজিটাল পরিচয়। ৪৭টি বাড়িরই একটি করে ইমেইল আইডি— দেখতে অনেকটা একই ফরম্যাটের 'hirachuni.XYZ@gmail.com'---XYZ মানে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নাম। ডিজিটাল হীরাচুনি এই নামে গ্রামের ফেসবুক অ্যাকাউন্টের পাশাপাশি একটি হোয়াটস্যাপ গ্রুপ এবং ব্লগও শুরু করা হয়েছে। ডিজিটাল ভারতের এই গ্রামের ইন্টারনেট--- বিএসএনএল, এয়ারটেল, আইডিয়া এবং রিলায়েন্স ৪ জি— এই চারটি মোবাইল সার্ভিস প্রোভাইডারের টাওয়ারের মাধ্যমে সংযুক্ত হয়েছে।

মোহাম্মদ ইমরান খান, রাজস্থানের আলোয়ার জেলার এক বিস্ময় ডিজিটাল প্রযুক্তি প্রতিভা। ৪০ বছর বয়সী মানুষটি মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের জন্য তৈরি করেছেন ৫২টি শিক্ষামূলক মোবাইল অ্যাপস, তাও আবার বিনামূল্যে। আর সেই কারণেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী লন্ডনে ভেম্বেলা স্টেডিয়ামের বক্তব্যে এঁর ভূয়সী প্রশংসা করেন। স্ব-শিক্ষিত এই কম্পিউটার প্রোগ্রামার, ওয়েব ডেভেলপার— সেই থেকে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড ইনফরমেশন টেকনোলজির সঙ্গে একযোগে কাজ করে চলেছেন। রাজস্থান সরকারের সংস্কৃত শিক্ষা বিভাগের এই গণিত শিক্ষকের তৈরি মোবাইল অ্যাপস এবং ওয়েবসাইটের মাধ্যমে লাভবান হয়েছে ৫০ লাখেরও বেশি

মানুষ। তাই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর প্রশংসা করে বলেন, ''আমার ভারত আমি আলোয়ারের ইমরানের মধ্যে দেখতে পাই''।

সারাদেশ থেকে সাধারণত সরকারি স্কুলগুলির দুরবস্থার কথাই শুনতে আমরা অভ্যস্ত ছিলাম। বেশ কিছু ক্ষেত্রে পরিকাঠামো ভেঙে পড়ার কথা কানে আসে। কখনও, শিক্ষকদের বিরুদ্ধে যথাযথভাবে ক্লাস না নেওয়ার অভিযোগ। অনেক স্কুল আবার উভয় সমস্যাতেই জর্জরিত।

মহারাষ্ট্রের একটি মাধ্যমিক সরকারি স্কুল কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা ছবি তুলে ধরেছে। প্রিন্সিপাল-সহ স্কুলের শিক্ষকেরা ক্রাউড ফান্ডিংয়ের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করেন, আর তারই সদ্ব্যবহারে স্কুলে এখন ওয়াই-ফাই-যুক্ত শ্রেণীকক্ষ, এলসিডি প্রজেক্টর এবং ল্যাপটপ ইত্যাদির ব্যবস্থা। এর প্রভাব মিলেছে হাতেনাতেই, মোট ছাত্র সংখ্যা ৪২ থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭৮।

জলগাঁওয়ের ঢেকুসিমে অবস্থিত এই স্কুলের উন্নয়নের জন্য প্রচার চলে সোশ্যাল মিডিয়াতেও, গ্রামের ১৮০০ জন মানুষ সাড়ে পাঁচ লাখ টাকা অনুদান জোগাড় করে। আর তাতেই এই আয়োজন— বললেন জেলা পরিষদ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সুরেশ পাতিল।

দু'বছর আগে মহারাষ্ট্র সরকার প্রগত শৈক্ষণিক কার্যক্রম শুরু করে, যেখানে তহবিল গঠনে জনসাধারণের অংশগ্রহণ ও তার প্রতিবেদন পেশ বাধ্যতামূলক করা হয়। কর্পোরেট সহায়তার জন্যও উৎসাহিত করা

হয়। এই সমবেত প্রচেষ্টাতেই খুলে যায় ডিজিটাল ক্লাসরুমের দরজা।

শিক্ষা ও গবেষণা ক্ষেত্রে অটল ইনোভেশন মিশন এবং মাই গভের (https://mygov.in) যৌথ উদ্যোগে শুরু হয়েছে 'ইনোভেট ইন্ডিয়া প্ল্যাটফর্ম' (https://innovate.mygov.in/innovateindia)। ন্যাশনাল ইনফরম্যাটিক্স সেন্টার (NIC) আর ডিপার্টমেন্ট অব ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড ইনফরমেশন টেকনোলজি (DeitY) দ্বারা পরিচালিত এই প্ল্যাটফর্ম বা পোর্টাল, সারাদেশের সমস্ত উদ্ভাবনের জন্য মূল কেন্দ্র হিসাবে কাজ করবে। ছোটো-বড়ো সকল প্রযুক্তিবিদের নিবন্ধীকরণ করে প্রয়োজনীয় উদ্ভাবনের জায়গা করে দেবে এটি। অর্থনৈতিক সুবিধা ও জাতীয়-সামাজিক চাহিদা পূরণের জন্য জটিল উদ্ভাবনে পোর্টালটি সাহায্য করবে। সকল ভারতীয় নাগরিকের জন্য উন্মুক্ত এই #InnovateIndia প্ল্যাটফর্মে সোশ্যাল মিডিয়ার মতোই মন্তব্য ও শেয়ার করা বা রেটিং দেওয়া যাবে, থাকবে পয়েন্টের মাধ্যমে র‍্যাঙ্কিং-ও। প্রত্যেকে তাঁর সংস্থার উদ্ভাবনগুলি আপলোড এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ারও করতে পারবেন অতি সহজেই। অটল ইনোভেশন মিশন (http://www.aim.gov.in) হলো একটি সহযোগিতামূলক বাস্তুতন্ত্র আর সোশ্যাল মিডিয়ার মিশ্ররূপ, যেখানে শিক্ষার্থী, শিক্ষক, বৈজ্ঞানিক, পরামর্শদাতা এবং শিল্প-উদ্যোগীরা নতুনত্বের সন্ধানে একত্রে কাজ করছে। অটল টিঙ্কারিং ল্যাবরেটরিজ (ATLs), অটল ইনকিউবেশন সেন্টার এবং এস্ট্যাব্লিশড ইনকিউবেশন সেন্টার— উদ্ভাবনের বাণিজ্যিকীকরণ ও তৎসংক্রান্ত শিল্পোদ্যোগ তৈরি করতে সাহায্য করবে। AIM ইতিমধ্যে সারাদেশে ২৪৪১টি স্কুল নির্বাচন করেছে, যা মোট জেলার ৯৩ শতাংশ আর আসন্ন স্মার্ট শহরগুলির ৯৮ শতাংশ জুড়ে ছড়িয়ে আছে।

ডিজিটাল ভারতে, যুব সম্প্রদায়ের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে হাত বাড়িয়েছে ফেসবুকের মতো বিশাল মাপের সোশ্যাল মিডিয়া কোম্পানিগুলি। ন্যাশনাল স্কিল ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন (https://www.nsdcindia.org)-এর সঙ্গে যৌথভাবে এই প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা। ডিজিটাল মার্কেটিং, অনলাইন নিরাপত্তা এবং আর্থিক স্বাক্ষরতা সহ বেশ কয়েকটি

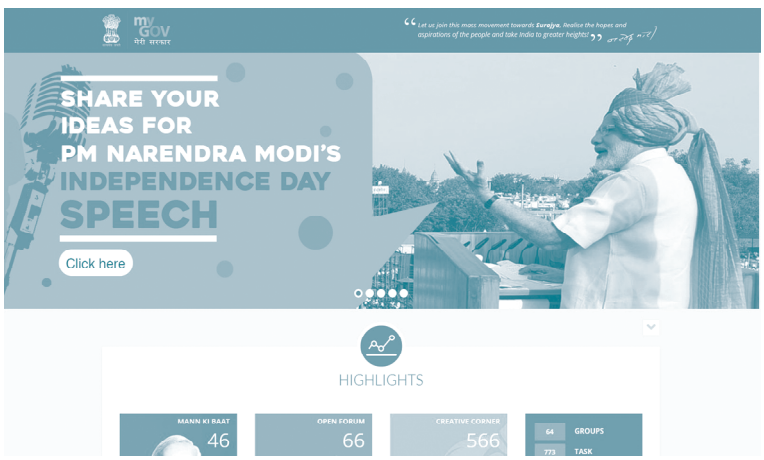

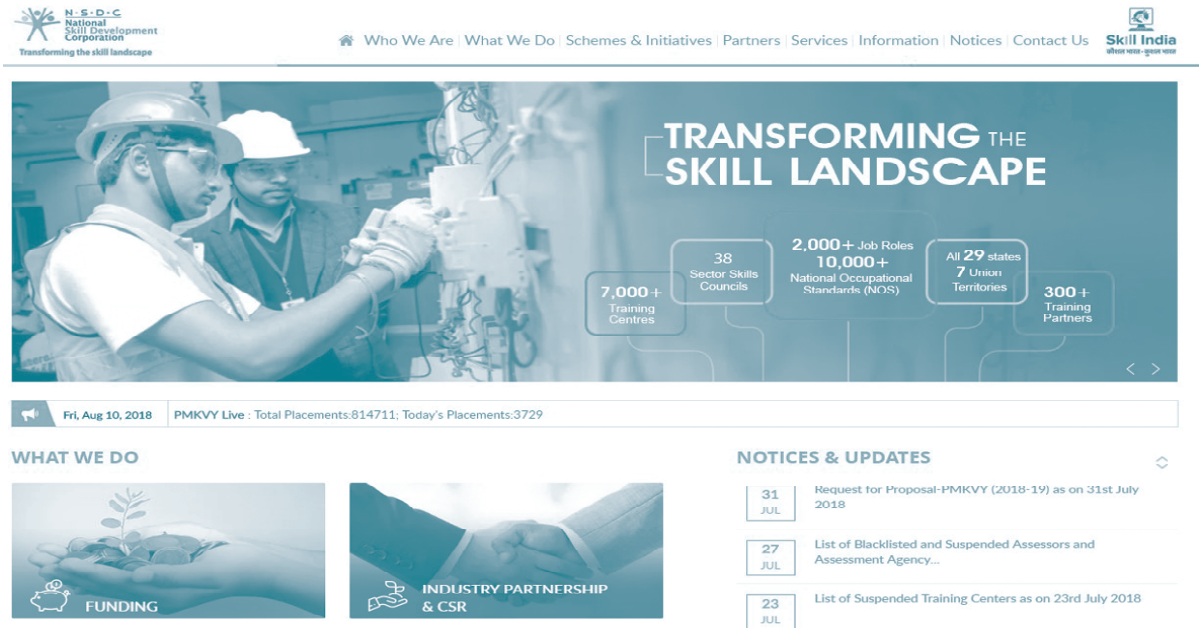

বিষয়ে এই পঠন-পাঠন চলবে একদম আঞ্চলিক ভাষায়। ট্রেনিং শেষে রয়েছে সম্ভাব্য নিয়োগকর্তাদের সঙ্গে অনলাইনে যোগাযোগের সুযোগ (www.facebook.com/jobs)। ফেসবুকের সঙ্গে যৌথভাবে পরিচালিত এই পাঠক্রমের অধীনে প্রশিক্ষিতদের জন্য কর্মসংস্থানে সহায়তা করবে কেন্দ্রীয় সরকারও, বলেছেন দক্ষতা উন্নয়ন এবং উদ্যোগ ক্ষেত্রের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। ডিজিটাল মার্কেটিং দক্ষতার ওপর ফেসবুকের এই প্রশিক্ষণ দেশের ১৬টি রাজ্যে #BoostYourBusiness কর্মসূচির অধীনে দু' লক্ষেরও বেশি তরুণ এবং উদ্যোক্তাকে সমৃদ্ধ করেছে। পাশাপাশি #SheMeansBusiness কর্মসূচির অধীনে বর্তমানে ৩০ হাজার মহিলা উদ্যোক্তা প্রশিক্ষিতা হচ্ছেন। ২০২০ সালের মধ্যে পাঁচ লক্ষ তরুণ এবং উদ্যোক্তা এই বিষয়ে প্রশিক্ষিত হবেন।

সরকারের সুশাসনে জনগণের যোগদানের সুযোগ করে দিয়েছে মাই-গভ সোশ্যাল পোর্টাল (https://mygov.in)। মাই-গভের মাধ্যমে অনলাইনে সরকারি কোনও বিষয়ে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক রূপান্তর প্রক্রিয়ায় সাধারণ নাগরিকদের যোগদানের সুবিধা রয়েছে। রয়েছে বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে মত বিনিময়ের জন্য সহজ ইন্টারফেস। এই প্ল্যাটফর্ম দেশের নীতি এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হয়ে উঠেছে। বিভিন্ন গভর্নেন্স এবং পাবলিক পলিসির বিষয়গুলির উপর ভিত্তি করে গ্রুপে-গ্রুপে আলোচনা, কাজ, বক্তব্য পেশ, পোল এবং ব্লগ— এই সবই পোর্টালের প্রধান বৈশিষ্ট্য। আজ মাইগভের ১.৭৮ মিলিয়ন ব্যবহারকারী রয়েছেন, যাঁরা এখানে বিভিন্ন আলোচনায় যোগ দেন আর বিভিন্ন নির্ধারিত কাজে অংশ নেন। প্রধানমন্ত্রীর মতে, মাইগভ এমন একটি উদ্যোগ, যা স্বশাসন বা 'সুরাজ'-কে গণ আন্দোলনে রূপান্তরিত করবে।

কলকাতা মেট্রোরেল শহরের জীবনযাত্রার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। হাজার হাজার মানুষ কাজে-কম্মে, স্কুল-কলেজে, অফিস-কাছারিতে মেট্রোর ওপরেই ভরসা রাখে। দুর্গাপুজার মরসুমে তো, প্রতিদিন প্রায় ২৪ ঘণ্টাই মেট্রো খোলা থাকে। টিকিট কাউন্টারের সর্পিল লাইনের শম্বুক গতি— এক দুর্বিষহ অভিজ্ঞতা। সমস্যার সুরাহা পেতে কলকাতা মেট্রোকে ডিজিটাল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কর্তৃপক্ষ। ব্যাংকের সঙ্গে কথা হয়েছে ই-ওয়ালেট থেকে টাকা দিলেই মিলবে টিকেট। টিকেটে একটি QR কোড তৈরি হয়ে যাবে, যেটা স্টেশনে ঢোকার সময়ে স্মার্ট গেটের সেন্সরে স্ক্যান করতে হবে। এই মোবাইল টিকেটিং ব্যবস্থাটি যাত্রীদের অসুবিধা হ্রাস করবে অনেকাংশে। মেট্রো ট্র্যাকিং পরিষেবাগুলির তাৎক্ষণিক খবরাখবর জনস্বার্থে প্রচারিত হবে সোশ্যাল মিডিয়ায়। সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মেট্রো আর জনজীবন দুয়েরই গতি বেড়ে যাবে অনেকটাই।

সময়, অর্থ আর পরিশ্রমের অপচয় রুখতে আজ প্রযুক্তির আপডেট অবশ্যম্ভাবী। আর আপডেট মানেই আগের সংস্করণের অভিজ্ঞতার বিচার-বিবেচনা। আর কে না জানে, ব্যক্তির চেয়ে সমষ্টির অভিজ্ঞতা অনেক দামি। তাই-ই সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং। পুরনো অভিজ্ঞতার চুলচেরা বিশ্লেষণে বেরিয়ে আসবে ভবিষ্যতের রাস্তা। এরই পোশাকি নাম আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স। ...যা হোক সে নিয়ে পরে কখনও আলোচনা করা যাবে। আজকের ডিজিটাল দুনিয়া কিন্তু এই পথেই এগিয়ে চলছে। ভারত তার সামনের সারিতে। মঙ্গল-যানের মহাকাশ পথের খুঁটিনাটি হোক বা মঙ্গলা-হাটের রাস্তাঘাটের জ্যামজটের আপডেট, সবই মুঠোফোনের এদিক-ওদিকে ছুটে বেড়াচ্ছে। আসলে সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা ও তার প্রতিক্রিয়াই উন্নতির প্রাণভোমরা। বর্তমান থেকে ভবিষ্যতের পথে ভারত তাই সোশ্যাল-ডিজিটাল। ▮

আত্মরক্ষা না আক্রমণ

কাগজে দেখলাম জমিয়ত উলেমায়ে হিন্দ নামক একটি সংগঠন আত্মরক্ষা বাহিনী তৈরি করছে। আত্মরক্ষার জন্য প্রতিটা মানুষেরই সমান অধিকার আমাদের এই সনাতনী ভারতবর্ষে আছে। এখানে হিন্দু-মুসলমান ভেদাভেদ দেখা হয় না। তার কারণ অবশ্য এদেশে গণতন্ত্র নামক শব্দটা মানা হয়। ভারতে হিন্দুরা আজও সংখ্যাগুরু। অন্যথায় বাংলাদেশ বা পাকিস্তানে কাফের বা মালাউন উপাধিতে ভূষিত সংখ্যালঘু হিন্দুদের মতো এদেশের হিন্দুদের আত্মরক্ষার অধিকারও জিজিয়ার উপর বা মুমিনদের দয়ার উপর নির্ভরশীল হতো।

জমিয়ত উলেমায়ে হিন্দ আজ হঠাৎ করেই বা কেন অনুভব করলো যে তাদের আত্মরক্ষাবাহিনীর দরকার আছে? আমার যতদূর মনে আছে আজকের মন্ত্রী এবং বিধায়ক সিদ্দিকুল্লা এই জমিয়ত উলেমায়ে হিন্দ থেকেই এসেছেন। জমিয়ত উলেমায়ে হিন্দ এই রাজ্যে কলকাতার রাজপথে প্রকাশ্যে পুলিশ পেটাই করেছিল। তাহলে এরা কি আত্মরক্ষার চিন্তা করে? না, কখনওই নয়। কারণ যারা পুলিশকে মারার ক্ষমতা রাখে তারা আত্মরক্ষা বাহিনী গড়বে এটা ভাবা উচিত নয়।

আসলে আত্মরক্ষার প্রয়োজন তখনই হয় যখন কেউ আক্রান্ত হয়। তাই এই আত্মরক্ষা বাহিনী গড়ার নাম করে দেশের মধ্যে সবচেয়ে বড় মুসলমান সংগঠন ভারতের প্রতিটা মুসলমানদের কাছে খবর জানালো— মুসলমানরা আক্রান্ত।

জানানো হলো গেরুয়া ব্রিগেড মুসলমানদের আক্রমণ করছে। অথচ এই দেশে মুসলমানদের হাতে আক্রান্ত বা মৃত হিন্দুর সংখ্যা অনেক বেশি। শুধু পশ্চিমবঙ্গকেই যদি ধরা যায় তাহলে দেখা যাবে রানিহাটি, দেগঙ্গা, আসানসোল, কালিয়াচক, বসিরহাট, নদীয়া এসব জায়গায় প্রচুর হিন্দু আক্রান্ত। আসলে এর পিছনে দু'রকম ব্যাপার কাজ করছে। প্রথমত, গোটা দেশে একটা বাতাবরণ তৈরি করা হলো 'ইসলাম খতরে মে'— মানে ইসলাম বিপদে। তাই সেই যুক্তিতে এই ধর্মীয় বাহিনীর সূত্রপাত, মানে ধর্মের উপর আক্রমণের কথা প্রচার করা। আর দ্বিতীয়ত, মোদী বা বিজেপি বিরোধিতার যে বাতাবরণ সারা দেশ জুড়ে কিছু স্বার্থান্বেষী রাজনৈতিক দল এবং পাকিস্তানের মদতকারীরা করে চলেছে তাতে আরও বেশি উৎসাহ দান করা। তবে এসবের মধ্যে চিন্তার বিষয় কিন্তু একটাই, আর তা হলো, আমাদের এই রাজ্যে আমাদের অবস্থা।

কারণ জমিয়ত উলেমায়ে হিন্দ এ রাজ্যে প্রবলভাবেই সক্রিয় কাজেই তাঁরা এখানে তথাকথিত 'আত্মরক্ষা বাহিনী' গড়বেই। তার ফলে এই রাজ্যে লুকিয়ে থাকা জামাত মানে বাংলাদেশি জেহাদি জামাতের কাজের আরও সুবিধা হবে। তারাও এই সব প্রশিক্ষণ শিবিরের নামেই নিজেরাও প্রশিক্ষিত গেরিলাদের নিয়ে এসে টুকটাক করে চালানো কার্যক্রমকে, ব্যাপক আকারে গড়ে তুলবে। আবার এ রাজ্যেই জামাই আদর করে আনা জেহাদি রোহিঙ্গা মুসলমানরাও লোভাতুর দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে কাফেরদের ধনসম্পত্তির দিকে। ফলে এক অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ ঘনিয়ে আসছে।

একদিকে যখন একটা মুসলমান সংগঠনের এক প্রধান দেশভাগের কথা বলে আর একদিকে অন্য মুসলমান সংগঠনের নেতারা জানায় কাশ্মীর আলাদা হোক, আবার কেউ জানায় ৩৫-এ অনুচ্ছেদ বাতিল হলে আগুন জ্বলবে ভূস্বর্গে, আবার বাংলাদেশের জঙ্গি সংগঠন জানায় দুই বাংলা এক হবে, জামাতের বোমা বানানোর কারখানা খাগড়াগড় হয়— ঠিক তখনই দেশের এক মুসলমান সংগঠনের প্রকাশ্যে আত্মরক্ষা বাহিনী' গঠনে স্বাভাবিক ভাবেই চিন্তা হয়, জিহাদের দামামা কি বেজে উঠলো? আপাত নিরীহ হিন্দু সমাজ আজ সুপ্ত, শুধু বিনিদ্র পাহারায় আছে মুষ্টিমেয় কিছু জাতীয়তাবাদী মানুষ। তাই এই সব অশনিসংকেত দেখে নিজেদের একত্রিত করতে না পারলে আগামী দিনে এই পশ্চিমবঙ্গকে 'বাংলা' নাম দিয়ে ধর্মের ভিত্তিতে টুকরো হয়ে পড়া এবং হিন্দু রক্তস্রোতের উপর দাঁড়ানো এই বঙ্গের নির্মম

চিঠিপত্র

ইতিহাস ভোলানোর চেষ্টা শুরু হয়ে গেছে, তার চরম খেসারত আমাদের দিতেই হবে।

—রুদ্র প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়,
বাউড়িয়া, হাওড়া।

বিরোধীরা ইভিএমে কারচুপি প্রমাণ করতে পারেনি

সম্প্রতি খবরে প্রকাশিত নরেন্দ্র মোদীর বিরোধী নেতারা দাবি তুলেছেন--- ২০১৯-এর নির্বাচনে ইভিএম মেশিন ব্যবহার না করে পুরানো পদ্ধতি ব্যালট পেপারে করতে হবে। ইভিএম-এর বোতাম টিপলেই নাকি তা গিয়ে পদ্মফুলে পড়ছে— এমন সার্কিট করা আছে। হাস্যকর যুক্তি! অথচ এর আগে যখন এই প্রশ্ন উঠেছিল তখন নির্বাচন কমিশনারের তরফ থেকে বিরোধী নেতাদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল তাঁরা এসে যেন সেটা প্রমাণ করে যান। তখন বিরোধী নেতাদের তরফ থেকে বিশেষ আগ্রহ দেখা যায়নি। নির্বাচনের সময় দু'একটি মেশিনে যান্ত্রিক ত্রুটি হতেই পারে, তা repair বা replacement করে দেওয়া হয়। যন্ত্রাংশে ত্রুটি স্বাভাবিক। বাড়িতে টিভি, ফ্রিজ, এসি, কমপিউটার ইত্যাদিতে কি গোলমাল হয় না? তা সারিয়ে নেওয়া হয়। তাই বলে কি আমরা তার ব্যবহার বন্ধ করে দিয়ে পুরানো ব্যবস্থায় ফিরে যাই?

নানারকম যন্ত্রপাতি কেনার ক্ষেত্রে নিয়ম আছে— যারা যন্ত্রটি তৈরি করে বা সরবরাহ করে, তাদেরকে যন্ত্রটি তৈরির পরে নির্দিষ্ট প্রযুক্তিগত নিয়মানুসারে তার কার্যকারিতা পরীক্ষা করে তা গ্রাহককে দেখাতেই হয় এবং এই performance test ক্রয়ের চুক্তির একটি অঙ্গ। বিরোধী নেতাদের যদি সন্দেহ হয় তবে তারা দাবি করতে পারেন যে—

ইভিএম যন্ত্র কেনার সময় যেন তাদের মনোনীত দু' একজন প্রযুক্তিবিদকে performance testing/inspection-এর সময় নেওয়া হয় এবং সেটা হবে যুক্তিসঙ্গত দাবি। তা না করে তারা এর ব্যবহারটাই বাতিল করতে চাইছেন। অদ্ভুত দাবি। এখন মাঝে মাঝেই শোনা যায় হ্যাকাররা ব্যাঙ্কের তথ্য লোপাট করে অনেকের টাকাপয়সা গায়েব করছে; তাই বলে কি আমরা দাবি করবো যে ব্যাঙ্কিং ব্যাবস্থা থেকে কমপিউটার, এ টি এম ইত্যাদির ব্যবহার তুলে দিয়ে পুরানো ম্যানুয়াল ব্যাবস্থাকেই ফিরিয়ে আনা হোক? না কি তা আর করা সম্ভব? আমরা ব্যবস্থাকে ত্রুটিমুক্ত করতে বলতে পারি। গাড়িতে অ্যাকসিডেন্ট হয় বলে তাঁরা কি বলবেন যে গাড়ি চড়বো না গোরুর গাড়িতে ফিরে যাব? এইসব নেতাদের ব্যাপার স্যাপার বড়ো অদ্ভুত! এরা আধুনিক সভ্যতার সঙ্গে এগোতে চাইছেন নাকি সভ্যতাকে পিছিয়ে দিতে চাইছেন? আধুনিক যন্ত্রের ব্যবহার না করে ১৩০ কোটির দেশে ভোট পরিচালনা করা কি সম্ভব?

এই দিগ্‌গজ নেতারা হেরে গেলে নিজেদের হার মেনে নিতে পারেন না; তাই তখন তাঁরা ই ভি এম-এর কারচুপির কথা বলে চেঁচামেচি করে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করেন। ২০১৯-এর নির্বাচনে ভরাডুবির আশঙ্কায় আগে থেকেই ইভিএম নিয়ে গাওনা আরম্ভ করেছেন যাতে হেরে গেলে হারের একটা যুক্তি মানুষকে দেওয়া যায়। কথায় বলে 'নাচতে না পারলে উঠোন বাঁকা'। এদের অবস্থাও হয়েছে তাই।

—প্রণব দত্ত মজুমদার,
কলকাতা।

শরণার্থী ও অনুপ্রবেশকারী

শরণার্থী ও অনুপ্রবেশকারী বিশ্লেষণ করতে গিয়েই আমার এই চিঠি। গত ৩০ জুলাই অসমে এন আর সি-র চূড়ান্ত খসড়া প্রকাশিত হয়েছে। এতে ৪০ লক্ষ লোকের নাম চূড়ান্ত খসড়া থেকে বাদ পড়েছে। এতেই চারিদিকে গেল গেল রব উঠেছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কুম্ভীরাশ্রু বর্ষণ শুরু হয়েছে। সবার মুখেই একই কথা— অসমের বিজেপি সরকার বাঙালি বিতারণের কাজে লিপ্ত হয়েছে। সমস্ত জায়গায় ভাইরাল হয়েছে, ভারতবর্ষের সমস্ত রাজ্য থেকে বাঙালিদের গলাধাক্কা দিয়ে বের করবে কেন্দ্র সরকার। অনেকের মধ্যেই গুঞ্জন শুরু হয়েছে দেশ ত্যাগ করা ছাড়া আর কোনো উপায়ই নেই। কিন্তু দুঃখের বিষয় অনেক বুদ্ধিমান লোকও এন আর সি-র অর্থ ভালো ভাবে বোঝার চেষ্টা করেন না। এই এন আর সি-র অর্থ হলো ন্যাশনাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট। মানে উদ্বাস্তুদের একটি বিশেষ সার্টিফিকেট প্রদান। অর্থাৎ স্বদেশী এবং বহিরাগতদের একটি নথি প্রস্তুতকরণ। এবার আসছি কে শরণার্থী এবং কে অনুপ্রবেশকারী। সেই প্রসঙ্গে শরণার্থী বলতে তাকেই বুঝায় যে ব্যক্তি মান সম্মান, জাতি, ধর্ম রক্ষার্থে অত্যাচারিত ও বিতাড়িত হয়ে অন্য দেশের আশ্রয়প্রার্থী হয়। আর অনুপ্রবেশকারী হলো যে সমস্ত ব্যক্তি অর্থনৈতিক কারণে বা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে নিজ দেশ থেকে অন্য দেশে ঢোকে। তবে একটা আশার কথা, বর্তমান মোদী সরকার বাংলাদেশ, পাকিস্তান এবং আফগানিস্তান থেকে আসা হিন্দুদের জন্য ২০১৬ সালে সংসদে একটি বিল নিয়ে এসেছে। এতে বলা হয়েছে ২০১৪ সালে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত যারা ভারতবর্ষে এসেছে তারা ইচ্ছে করলে এদেশে নিশ্চিন্তে থাকতে পারবে। সরকার এদের নিরাপত্তা দেবার সব রকম ব্যবস্থা করবে।

—স্বপন কুমার ভৌমিক,
শান্তিপুর, নদীয়া।

এন আর সি নিয়ে রাজনীতি কেন?

এন আর সি শব্দটি এখন একটি প্রচলিত শব্দ। বাইরে থেকে অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করার জন্য খুব ভালো একটা পদ্ধতি। যদিও অনুপ্রবেশকারী ও শরণার্থী আলাদা। এই পৃথিবীতে হিন্দুদের প্রধান বাসভূমি ভারত। তাই পৃথিবীর যে-কোনো প্রান্তে হিন্দুরা অত্যাচারিত হলে তাদের ভারতে আশ্রয় দিতেই হবে, না হলে এই হিন্দুরা কোথায় যাবে? কিন্তু যারা অন্য উদ্দেশ্য নিয়ে অবৈধ ভাবে ভারতে প্রবেশ করেছে তাদের চিহ্নিত করতেই হবে, তাদের কী হবে সেটা পরের বিষয়। সম্প্রতি অসমে চল্লিশ লক্ষ মানুষের নাম এন আর সি-তে বাদ গিয়েছে। যদিও সরকার থেকে বলা হয়েছে এটাই চূড়ান্ত নয়। কিন্তু এই নাম বাদ পড়া নিয়ে দেশের বিরোধী দলগুলি অহেতুক আন্দোলনে নেমেছে। সব থেকে বেশি মাতামাতি করছেন এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। উনি যে কী চাইছেন তাই স্পষ্ট নয়। এখানে মনে রাখতে হবে পুরো প্রক্রিয়া সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে পরিচালিত হয়েছে, অসম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে রাজীব গান্ধীর সময়। এখনো পর্যন্ত অসম থেকে কোনো গণ্ডগোলের খবর না পাওয়া গেলেও এই রাজ্যের শাসক দলের প্রতিনিধিরা এন আর সি চলাকালীন একবারও না গেলেও হঠাৎ কী করতে অসম গেলেন? আমাদের রাজ্যে মতুয়া সংগঠনের কিছু আন্দোলন সংগঠিত হচ্ছে। কিন্তু হিন্দু শরণার্থীদের নাগরিকত্ব প্রদানের বিষয়ে কেন্দ্র বা অসমের শাসক দলের তো আপত্তি নেই। আমাদের রাজ্যের শাসক দল এই বিষয়টিকে মান্যতা দিলে তো মতুয়া সমস্যা থাকে না। বিরোধীদের আন্দোলন কী কারণে? শুধু ভারত কেন অবৈধ অনুপ্রবেশ কোনো দেশ মানবে না। আর যারা আন্দোলন করছেন তারাই হিন্দু শরণার্থীদের নাগরিকত্ব প্রদান এখনো সমর্থন করেননি।

এই বাদ পড়াদের মধ্যে দুই ধরনের মানুষ আছেন, হিন্দু শরণার্থী ও অবৈধ অনুপ্রবেশকারী। যারা আন্দোলন করছেন তারা স্পষ্ট করুণ তাদের দাবি। তাঁরা বাদপড়া এই দুই ধরনের মানুষ সম্পর্কে কী অবস্থান নেবেন? শুধু বিরোধিতা করার জন্য আন্দোলন করার কোনো মানেই হয় না।

—পদ্মপ্রিয় পাল,
মুর্শিদাবাদ।

রাজ্যের সংবাদমাধ্যমে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ

নিবারণ চক্রবর্তী

তারিখটা ছিল ১২ জুন, ২০১১। টাউন হলে স্বাস্থ্য কর্তাদের সঙ্গে সদ্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম বৈঠক সমাপ্ত হয়েছে। ঘটনাচক্রে, সেদিন একটি স্বল্প পরিচিত ইংরেজি দৈনিক দি বেঙ্গল পোস্টে একটি বিশেষ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথম পাতা ব্যানার হেড লাইন। ''Terminally ill. Despite Mamata!'' দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় আরো বিস্তারিত প্রতিবেদন। ছবি সমেত প্রতিবেদন।

বিষয়? মুখ্যমন্ত্রী বিভিন্ন সরকারি হাসপাতাল পরিদর্শনে যাওয়ার এক মাস পরে, এক রবিবারে শহরের বিভিন্ন হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চেহারা। যা ছিল তথৈবচ। যন্ত্রণাদায়ক।

এর পরের দিন অর্থাৎ ১৩ জুন শোনা গেল ওই ইংরেজি দৈনিকের সম্পাদক ইন্দ্রনীল ঘোষকে পরিবর্তন করা হবে। কারণ, 'Despite Mamata' শব্দটা রতন টাটা ব্যবহার করেছিলেন। এ ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। সম্পাদক ''দিদি বিরোধী-সিপিএম পন্থী'' তাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে এ রকম করে কালিমা লিপ্ত করতেই এই ধরনের খবর করিয়েছেন।

যা গুঞ্জন ছিল, তাই বাস্তবায়িত হলো। রাতারাতি সম্পাদক অপসারিত হলেন।

গণশক্তির সম্পাদক অভীক দত্ত

আনন্দ বাজারের পত্রিকা সম্পাদক অভীক সরকার

এলেন নতুন সম্পাদক গৌতম চোধুরী। মনে রাখতে হবে যে, তখন কুণাল ঘোষ অ্যান্ড কোম্পানির উপর দিদিমণির প্রচণ্ড নির্ভরশীলতা। শুধু কী তাই, সারদা গ্রুপের সমস্ত সংবাদমাধ্যমের প্রধান তখন কুণাল। চারটে কাগজ (ইংরেজি, বাংলা, হিন্দি, উর্দু) এবং তিনটে খবরের টিভি চ্যানেল।

বাংলা খবরের কাগজ 'সকালবেলা'তেও বদলি করা হলো সম্পাদককে। ত্রিপুরায় খবরের কাগজ চালু করার দায়িত্ব দিয়ে। চ্যানেল টেন-এর দায়িত্বে থাকা হীরক করকে সরানো হলো। সবই কুণাল ঘোষের নির্দেশিত রাজনৈতিক অঙ্ক মতে।

এর আগে কলকাতা টিভির মালিকানা নিয়ে মামলা করেছিল টিভি ৬ গ্রুপ। মামলা হেরে গিয়ে তৃণমূল বৃত্তে থাকা মালিকরা শাসকদলের গুণ্ডাদের সাহায্যে দখল নেয়। আরো ঘটনা হলো, ২০১৬ সালে বিধানসভা ভোটের ফলাফল প্রকাশের ঠিক আগে একটি সমীক্ষা ওই চ্যানেল প্রকাশ করে। দাবি অনুযায়ী সমীক্ষাটা করেছিল আই এস আই-এর এক দল গবেষক। তাতে জয়ী হিসেবে ভারতীয় জনতা পার্টিকে দেখানো হয়। অনেকের প্রশ্ন ছিল— তৃণমূল নেতারা যে চ্যানেলের সম্পাদক প্যানেলে, সেখানে এটা হলো কী করে? তবে, ভোটের ফলাফল প্রকাশ হতেই দেখা গেল দিদি আরো বেশি আসনে জিতেছেন। এর পর দু'বছর প্রবল দুর্ভোগে কেটেছে ওই সংস্থার কর্মী ও সংস্থার। তৃণমূলের রোষ কমেনি। কিছুটা থিতিয়েছে। রোষের ফলে কী হলো?

অজ্ঞাত কারণে রাজ্যে সমস্ত কেবল সংস্থা ওই চ্যানেল সম্প্রচার বন্ধ করে দেয়। অনেক কষ্টে কিছু ডিস টিভি সংস্থা দেখালেও, রাজ্যবাসীর দৃষ্টি থেকে ওই সংবাদ সংস্থা অদৃশ্য হয়ে যায়। কর্মীদের মাইনে বন্ধ হয়ে যায়। তবে অনেক অনুনয় আর তৈল মর্দনের পর এখন ফের কিছুটা হলেও কেবল টিভির দর্শকের কাছে ফিরতে পেরেছে কলকাতা টিভি। তবে এসব নিয়ে রাজ্যের কোনো সাংবাদিকই প্রকাশ্যে আলোচনা করেন না।

বাংলা খবরের চ্যানেলে রাজনৈতিক নাক গলানোর কথা বলতে গেলে কাহিনি শেষ হবে না। কলকাতা টিভির আগে ২৪ ঘণ্টা নিউজ চ্যানেলের কথা অনেকেই ভুলে গিয়েছেন। বামফ্রন্টের শাসনকালে এই চ্যানেলের প্রধান ছিলেন শ্রী অভীক দত্ত।

কে তিনি? কেন আচমকা জি-টিভির সঙ্গে আকাশ বাংলার যৌথভাবে গড়া প্রতিষ্ঠানের প্রধান করা হলো ওই ব্যক্তিকে? তিনি সিপিএম-এর মুখপত্র গণশক্তির সম্পাদক ছিলেন, আছেন। যৌথভাবে দুটো সংবাদমাধ্যমের প্রধান

হলেন। আশ্চর্য হলেন?

একদিন-দু'দিন নয়, টানা সাত বছরের কাছাকাছি অভীক দত্ত এই দায়িত্ব সামলান। ফলে বলার অপেক্ষা রাখে না বাংলাতে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে রাজনৈতিক দখলদারি পুরনো বিষয়। শোনা কথা যে, তিনি পুলিশের বদলির বিষয়ে প্রভাবশালী ছিলেন। তাই ওই চ্যানেলের পুলিশ রিপোর্টারদের দাপাদাপিও বিপুল ছিল। ভেবে দেখেছেন, সিপিএম দলের রাজ্য সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য একটা 'বুর্জোয়া' নিউজ চ্যানেলের প্রধান। সেই সময় ২৪ ঘণ্টাতে ''আলিমুদ্দিন স্ট্রিট''-এর অনুমোদন আর স্পর্শে চাকরি হতো বলেই কথিত।

একদিন দেখা গেল এ এন আই থেকে বিতাড়িত হয়ে আচমকা চাকরি পেলেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের আপ্ত সহায়কের স্ত্রী সোমা মিত্র মুখোপাধ্যায়। বেশ চাকরি করছিলেন। কতটা বড় সাংবাদিক ছিলেন বিতর্ক আছে। তবে, শোনা গিয়েছিল তৃণমূল সরকার ক্ষমতায় আসার বছর তিনেক পর আচমকা তাঁকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়। বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ মহল আপত্তি করায় ২৪ ঘণ্টার ওই পদক্ষেপ বলে শোনা যায়। সামান্য হইচই হলো। তারপর চুপচাপ।

এখানেই শেষ নয়। ইটিভি নিউজ

অশোক দাশগুপ্ত, সম্পাদক আজকাল

বাংলার কাহিনি রোমাঞ্চকর। একদিকে রাজ্যসভায় ডেরেক ও ব্রায়েন সংবাদমাধ্যমের উপর চাপ সৃষ্টির জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে একহাত নিয়েছেন। অথচ তাঁর দলের সুপ্রিমোর হস্তক্ষেপের একের পর এক ঘটনায় পশ্চিমবঙ্গে সংবাদমাধ্যমের কর্মীরা হয়রান হচ্ছেন।

বছর তিনেক আগের ঘটনা। কোম্পানি তখন রিলায়েন্সের দায়িত্বে। রামোজি নেই। ধ্রুবজ্যোতি প্রামাণিক বাংলা খবরের চ্যানেলে নতুন এডিটর। বর্তমান খবরের কাগজ থেকে কালীঘাটের নির্দেশে তড়িঘড়ি পদত্যাগ করিয়ে ওই চ্যানেলে বিশেষ পরামর্শদাতা হিসেবে নিয়োগ করা হলো প্রবীর ঘোষালকে। বেশ চলছিল সরকার তোষণ। শোনা যায় এর মধ্যে একটা খবরে মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর বিরক্ত হয়।

কী ছিল খবরটা? জেলার এক বিজেপি সমর্থককে মারধর করে সারা গায়ে ছ্যাঁকা দিয়ে টি এম সি লেখা হয়। এই খবরটা বার বার সম্প্রচার করা হয়েছিল।

এরপরই ফের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে নতুন করে বিশেষ এডিটর (Senior Executive Editor) হিসেবে বিশ্ব মজুমদারকে নিয়োগ করা হয়। এডিটর ধ্রুবজ্যোতির দায়িত্ব লঘু করে দেওয়া হয়। এডিটর হলেও কাজ না থাকায় তিনি অফিসে বসে ফেসবুক করায় ব্যস্ত থাকতেন। এরপর তিনি সহকারী এডিটর হিসেবে ২৪ ঘণ্টা চ্যানেলে যান। সেখানে আরো কাহিনী আছে। স্থানাভাবে থামলাম।

প্রায় একইরকম ভাবে খবরের কাগজে রাজ্যের শাসকদলের নাক গলানোতে বলি হন দৈনিক স্টেটসম্যানের সম্পাদক মানস ঘোষ। অভিযোগ ছিল, তাঁর প্রভাবে ওই খবরের কাগজ ভণ্ড সেকুলার অবস্থান ছেড়ে দৃঢ় প্রতিবেদন প্রকাশ করছিল। সম্পাদক পরিবর্তনে ফের পুরোনো অবস্থানে ফিরে গিয়েছে ওই দৈনিক সংবাদপত্র।

শুধু সংবাদপত্র আর খবরের চ্যানেলই নয়, বর্তমান শাসকদল বিগত দু' বছর বকলমে কলকাতা প্রেস ক্লাবও নিয়ন্ত্রণ করছে। ২০১৭ সালে প্রেস ক্লাব নির্বাচনে কোনও বিরোধী প্রার্থী ছিল না। শোনা যায়, নবান্নের নির্ধারিত প্যানেলের প্রার্থীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছাড়াই জেতেন। চিত্রটা এ বছর পাল্টায়নি। ক্ষীণ বিরোধিতাও দেখায়নি সাহসী বীরপুঙ্গবরা। নবান্নের শিলমোহর দেওয়া প্যানেলই এ বছর জয়ী হয়েছে।

এ বছর আবার নীল সাদা প্যান্ডেল আর মুখ্যমন্ত্রীর ছবি সাটিয়ে প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করল কলকাতা প্রেস ক্লাব।

তাই, ডেরেক মহাশয়কে একটা কথা না বলে পারলাম না— ''সত্যিই তো। চোরের মায়ের আবার বড় গলা।'' ■

মিডিয়ার রাজনৈতিক চরিত্র

আনন্দবাজার পত্রিকা—	২০০৪-২০০৬	—মমতাপন্থী
	২০০৬-২০১১	—বামপন্থী
	২০১১-২০১৩	—মমতাপন্থী
	২০১৪-২০১৬	—তৃণমূল বিরোধী
	২০১৬	—মমতাপন্থী
বর্তমান	১৯৮৪-২০১১	—প্রতিষ্ঠান বিরোধী
	২০১১	—মমতাপন্থী

সংবাদ প্রতিদিন— প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বামপন্থী ২০১১-র পর মমতাপন্থী।

আজকাল— প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বামপন্থী ২০১১-র পর মমতাপন্থী।

নাগরিকপঞ্জি অথবা রাক্ষসের প্রাণভোমরা

প্রবাল চক্রবর্তী

মৌচাকে ঢিল পড়লে যেরকমটা হয়, অনেকটা সেরকমই লম্পঝম্প শুরু হয়ে গেছে সম্প্রতি। গাঁয়ে-মানে-না-আপনি- মোড়ল গোছের আঁতেলরা দাড়ির ওপর রোদচশমা লাগিয়ে বুক চাপড়ে পা থেবড়ে বসে রুদালিগিরি করছে। বাঙালির দুঃখে তাদের আছাড়ি-পিছাড়ি দেখে জম্বুদ্বীপের জনগণ রীতিমতো বাক্‌রুদ্ধ। হৃদয়বিদারী এই দুঃখশোকের কারণ কী? অসমের নাগরিকপঞ্জিতে নাকি সেখানকার বাঙালিদের সব্বোনাশ হয়ে গেল। তাই, যে বাঙালি এই নাগরিকপঞ্জির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবে না, সে নাকি বাঙালিই নয়। ওদের বলি— ভাই রে, আন্তর্জাতিকতাবাদ ছাপিয়ে তোদের মনে এই যে স্বজাতিপ্রেম জেগে উঠেছে, এটা দেখে তো হৃদয়টা জুড়িয়ে গেল রে! চোখে জল এসে গেল! মধু মধু!

এন আর সি-র প্রতিবাদে তৃণমূল নেতাদের বিক্ষোভ।

সন্দেহটা কোথায় জাগছে জানেন? সব হৈচৈটাই হচ্ছে আমাদের এই খণ্ডিত বঙ্গে। অসম চুপচাপ। যার বিয়ে তার হুঁশ নেই, পাড়াপড়শির ঘুম নেই। কেন বলুন তো?

ঠাকুমার ঝুলির গল্পে একটা রিপিটেড থিম থাকতো। রাক্ষসের প্রাণ লুকোনো আছে এক ভোমরার বুকে। সেই ভোমরা আছে এক সিন্দুকের মধ্যে, সিন্দুক লুকোনো আছে তেপান্তরের মাঠের ধারে কোনও এক দিঘির জলের তলায়। তাই যে যতই আঘাত করুক না কেন, রাক্ষসের কোনো ক্ষতিই সে করতে পারে না। কিন্তু যেই না রাজকুমার ভোমরার খোঁজে দিঘিতে ঝাঁপ দিয়েছে, অমনি একশো মাইল দূরে রাক্ষসের টনক নড়ে উঠলো। বুক ধড়ফড়, প্রাণ আইঢাই, রাক্ষস দৌড়োলো দিঘির দিকে। যেভাবে হোক, রাজকুমারকে আটকাতেই হবে। দেখেশুনে মনে হচ্ছে, বাংলার অনেক রাক্ষসেরই প্রাণভোমরা লুকোনো আছে অসমের নাগরিকপঞ্জিতে। অসমের সাফল্য দেখে যদি পশ্চিমবঙ্গেও নাগরিকপঞ্জি চালু হয়? তাহলে তো রাক্ষসদের খেল খতম! তাই গুষ্টিসুদ্ধ রাক্ষস-খোক্কসরা অসমে দৌড়োচ্ছে, হিল্লি-দিল্লি সর্বত্র দৌড়োচ্ছে, রাগে মাটিতে আছাড়ি-পিছাড়ি খাচ্ছে। রাজকুমারকে আটকাতেই হবে, জান কবুল!

এরা বলছে, অসমে নাগরিকপঞ্জি তৈরি করে ভারত নাকি বিরাট একটা মানবাধিকার লঙ্ঘনের অপকর্ম করে ফেলেছে। তাই নাকি? হতেও পারে। তা, এ বিষয়ে অন্যান্য দেশগুলো কী করছে, দেখা যাক। দেখা যাচ্ছে, পাশ্চাত্যের প্রতিটি দেশেই নাগরিকপঞ্জি রয়েছে। সীমান্ত পার করে ঢুকে পড়লেই নাগরিকত্বের মোয়া হাতে পেয়ে যাবে, এমনটা কোনো দেশেই হয় না। এভাবে বেড়া টপকে গোঁত্তা মেরে ঢুকে পড়ার সাজা বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকম। অস্ট্রেলিয়ায় এরকম লোকজনদের সঙ্গে সঙ্গে ‘ডিটেনশন সেন্টার’ বা জেলখানায় পাঠানো হয়। বছর দশেক সেখানে জেলের লপসি

বাংলাদেশের মুসলমানরা শরণার্থী নয় : তথাগত রায়

ধর্ম, ভাষা, জাতি এবং বর্ণের কারণে অত্যাচার ও গণহত্যার ভয়ে যদি কেউ নিজের দেশ ছেড়ে অন্য দেশে আশ্রয় নেন তাকে শরণার্থী বলা হয়। কিন্তু অর্থনৈতিক কারণে কেউ অন্য দেশে বসবাস করলে তাকে শরণার্থী বলা যায় না। তিনি অনুপ্রবেশকারী। এমনকী একজন বৃদ্ধও যদি রুটিরুজির আশায় অন্য দেশে প্রবেশ করেন তাহলে সেই দেশটির চোখে তিনি অবৈধ অনুপ্রবেশকারী। রাষ্ট্রপুঞ্জের সংজ্ঞা অনুযায়ী, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ থেকে যেসব হিন্দু শিখ খ্রিস্টান এবং বৌদ্ধ ভারতে চলে আসছেন তারা সকলেই শরণার্থী। কিন্তু মুসলমানরা নন। কারণ পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ ইসলামিক দেশ। সেখানে মুসলমানদের ওপর অত্যাচার হতেই পারে না।

খাবার পর যদি প্রমাণ হয়, লোকটি সত্যিই প্রাণের দায়ে পালিয়ে এসেছে, তখন অস্ট্রেলিয়ায় থাকার অনুমতি মেলে। প্রায় এমনটাই ব্রিটেনেও হয়। আর উত্তর কোরিয়া, ইরান, সৌদি বা আফগানিস্তানে? তৎক্ষণাৎ হাতেগরম গুলিগোলা, ধাঁই ধাঁই ধাঁই!

ভারত সরকার যেটা করছে, সেটাকে কোনোমতেই অন্যায় বলা যায় না। বরং ভারত স্বাধীন হওয়ার পরপরই এমনটা করা উচিত ছিল। নিয়ম করা উচিত ছিল, সাতচল্লিশের পনেরোই আগস্টের পর যারাই সীমান্ত পার হয়ে ভারতে ঢুকতে চাইবে, তাদের এই মর্মে দরখাস্ত করতে হবে যে, তারা ওপার বাংলায় সেখানকার মুসলমানদের দ্বারা ধর্মীয় নিপীড়নের শিকার, সেখানে সম্মানের সঙ্গে প্রাণধারণ অসম্ভব। এক ঢিলে দুই পাখি মারা যেতো তাতে। লেবেনস্রমের উদ্দেশ্যে ভারতে আসা মুসলমান অনুপ্রবেশকারীদের পত্রপাঠ ফেরত পাঠানো যেত। হিন্দু শরণার্থীদের ক্ষেত্রেও, হাতে নাতে তাদের নিজেদের জন্মভূমির রূঢ় বাস্তবটার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া যেত। ছিন্নমূল পরিবারগুলোকে স্টোকহোম সিনড্রোম ও তার ফলে জন্মানো আত্মঘাতী সেকুলারিজম্ থেকে রক্ষা করার এটাই ছিল একমাত্র উপায়। আমি নিজে ছিন্নমূল পরিবারের সন্তান, তবু একথা বলতে আমার সংকোচ নেই। দেরিতে হলেও এই ব্যাপারটা শুরু হয়েছে, খুব ভালো হয়েছে।

শহুরে নকশাল আঁতেলবাবুরা বলছেন— ওপারেও বাঙালি, এপারেও বাঙালি। বাঙালি জাতিসত্তা, অখণ্ড জাতিসত্তা। বাঙালি নিপীড়িত হচ্ছে, আর আমাদের প্রাণে ব্যথা জাগছে না? ছিঃ!

যারা অখণ্ড ভারতের নামে ভয়ে কানে আঙুল দেয়, তারা যখন অখণ্ড জাতিসত্তার কথা বলে, শুনে ঘোড়ারও হাসি পায়। তা বলি হে বাপু, কও তো—বাঙালি কে? বাঙালির সংজ্ঞা কী? ইংরিজি বললেই ইংরেজ হয় না। যারা পর্তুগিজ ভাষায় কথা বলে, তারা সবাই পর্তুগিজ নয়। ফরাসি ভাষায় কথা বলার ক্ষমতাটাকে ফরাসি জাতিসত্তায় সম্পৃক্ত হবার প্রমাণ হিসেবে দাখিল করা যায় না। তেমনি, বাংলা বললেই বাঙালি হয় না। বর্মার লুঙ্গি আর আরবের দাড়ি, ইরানের জুবান আর উজবেগ নাড়ি— তবু শুধু বাংলা বলি বলেই বাঙালি? এমন বছিরুদ্দি-মার্কা জনগোষ্ঠীকে কি বাঙালি

অখণ্ড ভারতের নামে যারা ভয়ে কানে আঙুল দেয়, তারা যখন অখণ্ড জাতিসত্তার কথা বলে, শুনে ঘোড়ারও হাসি পায়। তা বলি হে বাপু, কও তো—বাঙালি কে? বাঙালির সংজ্ঞা কী?

বলা চলে? যাদের নিজেদের ছেলেপুলেদের নাম বাংলায় রাখার সাহস নেই, তারা কীসের বাঙালি? ধুতি পরতে পারবো না, হাতজোড় করে নমস্কার করতে পারবো না, তবুও নিজেকে বাঙালি বলবো? দোল, দুর্গোৎসব, কীর্তন আর পরান বাউল বাদ দিলে বাঙালিয়ানা আর রইল কীসে?

পাঁচ হাজার বছর আগেও পৌণ্ড্রবর্ধন ছিল, দু'হাজার বছর আগেও গঙ্গারাঢ়ীরা ছিল, দেড় হাজার বছর আগেও গৌড় মল্লার ছিল। বঙ্গসংস্কৃতির একটা চিরন্তন ধারা রয়েছে, যেটা হিন্দু সংস্কৃতিরই এক বিশিষ্ট ধারা। সেটাকে ভুলে গিয়ে বাঙালি হওয়া যায় না। চৈতন্য-বিবেকানন্দকে অস্বীকার করে বাঙালি হওয়া যায় না। গৌরগোবিন্দ আর প্রতাপাদিত্যর হত্যাকারীদের যারা গুরুঠাকুর ঠাউরেছে, তাদের আর যাই হোক, বাঙালি বলে মানতে পারবো না। ভুলে গেলে চলবে না, ভারতভাগে সবচেয়ে বেশি উৎসাহ ছিল পূর্বের মুসলমানদের। নোয়াখালিতে যে বর্বরতা ওরা দেখিয়েছিল, তাতে কোহাটের পাঠানরাও লজ্জা পাবে। বাঙালি বলে এদের বুকে টানলে এরা পরমুহূর্তে আফজল খাঁ হয়ে যাবে। মেলায় হারিয়ে যাওয়া ভাইয়ের মুখোশের আড়ালে এরা আসলে মগজধোলাইপ্রাপ্ত ট্রোজান হর্স, আন্তর্জাতিক ইসলামের দাবার বোড়ে। সাধু সাবধান! তাই বলি, হোক্ কলরব! মানে, হোক্ নাগরিকপঞ্জি! শুধু অসমে নয়, আমাদের এই খণ্ডিত বঙ্গেও। সত্যি বলতে কী, আমাদের ওটার দরকার ওদের চেয়ে অনেক বেশি। ওদের দুধে ভেজাল লাখে, আমাদের তো কোটিতে!

শহুরে নকশালি খোকা-খুকুরা এসব বুঝেও বোঝে না। গান্ধীনোটের ঠুলি ওদের চোখে, গরিবের মাংস খেয়েই ওদের তাগত জোটে। এইসব নরভোজী আঁতেলরা এককালে পিসিকে অনেক টিটকিরি দিয়েছে। সেসব ভুলে পাল্টি খেয়ে আজ পিসিই এদের অগতির গতি। এসব শখের নকশালিরা সবাই মিলে হত্যে দিয়ে পড়েছে টানামূলোর শালাশালীদের পদরজে। ঠেলাঠেলি করছে— কে আগে ভাইপোবাদের কলমা পড়বে, সেজন্য। পিসিও খুব খুশি এইসব আঁতেলদের বগলদাবা করে। এদের বলে বলীয়ান হয়ে পিসি এবার খেপে উঠেছেন। ভাবছেন, ঘোলাজলে পানসি ভাসিয়ে সারা দেশের মুসলমান ভোট একজোট করে ফেলবেন, সে ভোটের একমাত্র খুচরা ও পাইকারি কারবারি হয়ে কাক্কেশ্বর কুচকুচের মতো মগডালে চড়ে বসবেন। এও বোধহয় ভাবছেন, 'দেশের প্রথম বাঙালি প্রধানমন্ত্রী'র খুড়োর কল দেখিয়ে পশ্চিমবঙ্গের সবকটা লোকসভার আসন জিতে নেবেন অনায়াসে।

ভাবতে বাধা নেই। স্বপ্ন দেখতে ট্যাক্স লাগে না। কিন্তু কী জানেন, দিনকাল বড্ডো খারাপ যাচ্ছে। সত্যিকারের বাঙালিগুলো আগে চুপচাপ থাকতো, তাই মিথ্যেকারের বাঙালিগুলোকে দিয়ে বারবার ভোটে কেল্লাফতে করা গেছে। পরিস্থিতি এখন আর তেমনটা নেই, 'পরিস্থিতি' এখন 'পেত্নীস্থিতি' হয়ে গেছে। সত্যিকারের বাঙালিগুলোর মতিগতি আজকাল মোটেও ভালো ঠেকছে না। কেমন যেন রাগী-রাগী হয়ে গেছে ওরা আজকাল। কথায়-কাথায় ফস্ করে টাঙ্গি-কাটারি বার করছে, মাথায় গেরুয়া ফেট্টি বেঁধে 'জয় শ্রীরাম' বলে হুংকার ছাড়ছে। ওরা আজকাল বলছে— দীঘা থেকে শিলচর, পিসির জন্য কিলচড়। যারা পিসির ভাইপো হবে, তাদের জন্যও কিলচড়। তাই বলি কী, আগেভাগে সাবধান করে দিলাম, চাচা আপন প্রাণ বাঁচা। তবুও যদি ভাইপোবাদের কলমা পরার ইচ্ছে থেকে থাকে কারোর, পড়ুক তারা কলমা। ওই সত্যিকারের বাঙালিরা তাদেরকে দেখে নেবে। আমরা গ্যালারিতে বসে মজা দেখবো। থ্রি টিয়ার্স ফর দি গ্রেট টানামূলো সার্কাস, হ্যাপ হ্যাপ হার রে! হারেরেরেরেরে!

(লেখক অস্ট্রেলিয়ায় কর্মরত)

মমতার স্বপ্নাদেশে বাঙালি বুদ্ধিজীবীর পুতুলনাচ

চন্দ্রভানু ঘোষাল

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় তাঁর পাঠককুলকে স্তম্ভিত করে দিয়েছেন। অসমে জাতীয় নাগরিকপঞ্জির প্রাথমিক খসড়া প্রকাশিত হবার পর অনেকেই নানারকম মন্তব্য করেছেন। কিন্তু তার মধ্যে সব থেকে বেশি চোখে পড়েছে শীর্ষেন্দুবাবুর মন্তব্য। শীর্ষেন্দু বলেন, 'অতীতে একবার সব হারিয়ে এখানে এসেছিলাম, এবার হয়তো ফের আর একবার সব হারাতে হবে। কিন্তু, এবার কোথায় যাব তা জানি না।' আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, শীর্ষেন্দু অবিকল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুরে কথা বলেছেন। ভাষারও খুব বেশি হেরফের করেননি। বলে না দিলে বোঝা মুশকিল কথাটা আসলে কে বলছেন! সম্ভবত ভেবেও দেখেননি, তিনি যেটা করলেন সেটা সর্বোচ্চ আদালতের অবমাননা ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ অসমে পঞ্জিকরণের কাজ হয়েছে সর্বোচ্চ আদালতের রায়ে এবং প্রত্যক্ষ তদারকিতে। এখানে সর্বানন্দ সোনোয়াল, দিলীপ ঘোষ বা নরেন্দ্র মোদীর কিছু করার নেই।

মমতার 'পুতুলনাচের ইতিকথা'য় মুখ দেখিয়েছেন অনেকেই। নৃসিংহ প্রসাদ ভাদুড়ী, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকান্ত আচার্য, ধৃতিমান চট্টোপাধ্যায় পি.কে. বন্দ্যোপাধ্যায়...। তাদের কথায় বাঙালি সমান বিপন্ন বোধ করলেও, শীর্ষেন্দুর ব্যাপারটা আলাদা। একে তো তিনি আধ্যাত্মিক মানসলোকের বাসিন্দা। ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের প্রিয় শিষ্য। তার ওপর জনপ্রিয় সাহিত্যের স্রষ্টা হয়েও তিনি নিজের সাহিত্যবোধের সঙ্গে কখনও আপোশ করেননি। অথচ সেই তিনি মমতার রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করতে একটি জলজ্যান্ত মিথ্যে কথা বললেন। দেশভাগের সময় এবং তার পরেও যে-লক্ষ লক্ষ হিন্দু বাঙালি পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গে এসেছেন, সুকৌশলে তাঁদের মনে একটা বিশ্রী ভয় ঢুকিয়ে দিলেন। যেন নরেন্দ্র মোদী নামের এক 'দানব' তাঁদের সকলকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেবার ষড়যন্ত্র করছে। এবং তাঁরা যেন কোনওভাবেই ২০১৯-র লোকসভা নির্বাচনে ষড়যন্ত্রকারী বিজেপিকে ভোট না দেন। সেই ভোট যেন সোজা মমতার বাক্সে গিয়ে পড়ে।

একবার এক লেখক বন্ধু মজা করে বলেছিলেন, বাঙালি লেখকরা সেকুলার, তার কারণ বাংলাদেশের বাজার। পশ্চিমবঙ্গে হিন্দু বাঙালির শেক্সপিয়ার আছেন। কামু-কাফকা আছেন। চেতন ভগত, অমিতাভ ঘোষরা আছেন। সঙ্গে আছে ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের

কোটি কোটি মানুষ বিভ্রান্ত হন। কষ্ট পান। ভূলুণ্ঠিত হয় সাহিত্যিকের ধর্ম। কিন্তু শীর্ষেন্দুবাবুরা সেকুলারই থেকে যান। যে দেশে তাঁর জন্ম তার কথা ভাবার অবকাশ পান না।

আগ্রাসন। ফলে পশ্চিমবঙ্গের বাঙালির কাছে বাংলা সাহিত্য পড়ে পাওয়া চোদ্দ আনা গোছের ব্যাপার। 'আমার ছেলে বাংলায় একটু কাঁচা'— এই জাতীয় শব্দবন্ধ হাটেবাজারে প্রায়ই শোনা যায়। কিন্তু বাংলাদেশে ব্যাপারটা একটু অন্যরকম। সেখানে বাংলা বইয়ের বাজার খ্যাপা ষাঁড়ের মতো দৌড়োয়। সুতরাং এপারের লেখকরাও বাংলাদেশের বাজারে দোকান দিতে বাধ্য হন। কিন্তু এতগুলো হিন্দু লেখককে ইসলামিক বাংলাদেশ বাজারে বসতে দেবে কেন? তাই বলতে হয়, আমরা সেকুলার। ধর্মনিরপেক্ষ। আমাদের একটা অখণ্ড ভারতীয় জাতিসত্তা আছে, কিন্তু আমরা সেটা মানি না। মানলেই আমাদের হিন্দু শোকড় বাকড় বেরিয়ে পড়বে। আমরা বাঙালি। আমাদের নিজস্ব জাতিসত্তা আছে। যে জাতিসত্তাকে কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে দ্বিখণ্ডিত করা যায় না। এই জাতিসত্তার কোনও সীমারেখা নেই। দেশ নেই। ইত্যাদি।

আক্ষেপ একটাই। এই প্রবীণ বয়েসে শীর্ষেন্দু পুতুলনাচে অংশগ্রহণ না করলেও পারতেন। তার জন্য সুবোধ সরকার আছেন। অরিন্দম শীল আছেন। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় সারাজীবন মহৎ সাহিত্য রচনা করেছেন। তাঁর মানব জমিন, পার্থিব অজস্র তরুণ লেখককে স্বপ্ন দেখিয়েছে। সাহিত্য তো শুধু ভাষার জাগলারি নয়, সৎ সাহিত্য মানেই আদর্শবাদী সাহিত্য। যে আদর্শ লেখক ছড়িয়ে দেন শব্দ থেকে শব্দে, এক অধ্যায় থেকে পরবর্তী অধ্যায়ে। বলতে বাধা নেই, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের বহুলাংশে ভারতীয়ত্বের আদর্শকেই ধারণ করে এসেছেন এতকাল। কিন্তু বৃদ্ধ শীর্ষেন্দুর সেই সাহস নেই। তাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডুবতে বসা নৌকো উদ্ধারে তাঁকে এগিয়ে আসতে হয়। সেকুলার ড্রামায় বিশ্বাসযোগ্য দক্ষতায় ফুটিয়ে তুলতে হয় বিবেকের চরিত্র।

কোটি কোটি মানুষ বিভ্রান্ত হন। কষ্ট পান। ভূলুণ্ঠিত হয় সাহিত্যিকের ধর্ম। কিন্তু শীর্ষেন্দুবাবুরা সেকুলারই থেকে যান। যে দেশে তাঁর জন্ম তার কথা ভাবার অবকাশ পান না।

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

অসম ভারতকে বিদেশিমুক্ত করবার পথ দেখিয়েছে, এরপর পশ্চিমবঙ্গ

মোহিত রায়

অসমে নাগরিকপঞ্জি নবায়নের কাজ একরকম শেষ হলো। এতে ৪০ লক্ষের বেশি কিছু মানুষকে বিদেশি অর্থাৎ বাংলাদেশি হিসাবে চিহ্নিত করা গেছে, যদিও তাদের আবার আবেদন করার সুযোগ রয়েছে। এই একটি প্রায় অসম্ভব কাজটি শুরু করাবার সব কৃতিত্ব অসমের ছাত্র সমাজের। ১৯৭৯ থেকে ১৯৮৫ এই ছয় বছর ধরে অনেক সংগ্রাম রক্তক্ষয়ের পর, ১৯৮৫ সালে প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস দলের কেন্দ্রীয় সরকার ছাত্রদের যেসব দাবি মেনে নেয় তার মধ্যে একটি প্রধান দাবি ছিল অসমে বসবাসকারী বিদেশিদের চিহ্নিত করবার জন্য জাতীয় নাগরিকপঞ্জিকে নতুন করে আবার তৈরি করা। ৪৩ বছর পর কাজটি সম্পন্ন হলো। এর মধ্যে দীর্ঘদিন অসমে কংগ্রেস সরকার থাকলেও তারা এ ব্যাপারে খুব একটা উচ্চবাচ্য করেনি, করেনি অসম গণপরিষদের সরকারও (অগপ)। কিন্তু অসমবাসীর কাছে বিষয়টি সবসময় একটি জ্বলন্ত সমস্যা হয়েই রয়েছে। শেষ পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্টের রায়ে বিজেপির নেতৃত্বে প্রথম অসম সরকার কাজটি সুসম্পন্ন করলো।

এতক্ষণ বিদেশি কথাটা বলা হলেও আসলে বিষয়টি অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশিদের নিয়ে। এই অনুপ্রবেশকারীদের সিংহভাগ মুসলমান সম্প্রদায়ের। বাঙালি অসমীয়র পুরানো দ্বন্দ্ব ছিল তা মূলত বাঙালি অর্থাৎ হিন্দুর অসমের চাকরি-শিক্ষা ইত্যাদিতে প্রাধান্যজনিত বঞ্চনার অভিযোগ নিয়ে, যার জন্য কয়েকবার বড়সড় আক্রমণ বাঙালি হিন্দুর উপর হয়েছে, বাঙালি মুসলমানরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। ১৯৭৯-র অসম ছাত্রসমাজের দাবি বাঙালি বিরোধী ছিল না, ছিল বিদেশি তাড়াও অর্থাৎ মুসলমান হঠাও। এবার কিন্তু ব্যাপারটা আগের মতন সহজ রইলো না, সরকারি অফিস ও তৈল শোধনাগার ঘেরাও আর লাগাতার বন্ধের মধ্যে সীমাবদ্ধ রইলো। অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশি মুসলমানদের হটানোর দায়িত্ব তারা সরকারের ওপর ছেড়ে দিলেন। এবং তারা (আন্দোলনকারীরা, আসু) সরকারে এলে কড়া কদম নেবেন বলে আওয়াজ তুললেন। ১৯৭৯ থেকে ১৯৮৫, এই ছ' বছরের আন্দোলনের সমাপ্তিতে হলো কেন্দ্রে কংগ্রেস সরকারের সঙ্গে অসম চুক্তি।

অসমে মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধি (শতকরা হিসাবে)

বর্ষ	১৯৫১	১৯৬১	১৯৭১	১৯৯১	২০০১	২০১১
মুসলমান	২৪.৬৮	২৫.৩	২৪.৫৬	২৮.৪৩	৩০.৯১	৩৪.২২
১৯৮১-তে অসমে জনগণনা হয়নি						

কোনও দেশ দখলের জন্য সৈন্যবাহিনীর থেকেও অনেক বেশি শক্তিশালী হলো অনুপ্রবেশ (যা এখন ইউরোপে চলছে)। নীচে অসমের ধর্মীয় জনগণনার হিসাব দেখলেই বোঝা যাবে যে জনগণনার ফলাফল জানবার আগেই বাস্তব অবস্থা দেখেই অসমের ছাত্র সমাজ বিদেশি খেদাও অর্থাৎ বাংলাদেশি মুসলমান খেদাও আন্দোলন শুরু করে। যদিও সেই জনগণনাই আবার দেখাবে যে এ ব্যাপারে অসমীয় হিন্দু সমাজ চূড়ান্ত ব্যর্থ হয়েছে। স্বাধীনতার পর ১৯৫১ সালে অসমে (বর্তমান অসম, কারণ সেই সময়ের অসমে অনেক অংশ এখন অন্য রাজ্য হয়ে গেছে) রাজ্যের মুসলমান জনসংখ্যা ছিল ২৪.৭ শতাংশ। তার কুড়ি বছর পর ১৯৭১ সালে সেই অনুপাত প্রায় একই থাকে, ২৪.৬ শতাংশ। ১৯৮১ সালে আন্দোলনের জন্য জনগণনা হয়নি। ১৯৯১ সালে মুসলমান জনসংখ্যার অনুপাত বেড়ে হয়ে গেল ২৮.৪ শতাংশ। অর্থাৎ আগের কুড়ি বছরে কোনও বৃদ্ধিই হয়নি, অথচ ১৯৭১ সালের পর অর্থাৎ বাংলাদেশ হবার পর কুড়ি বছরে বেড়ে গেল ৪ শতাংশ! অসমের ছাত্র সমাজকে অভিনন্দন যে, কোনো জনগণনা না হওয়া সত্ত্বেও তারা দেখতে পেয়েছিলেন যে অসমে মুসলমান অনুপ্রবেশ কী ভয়ংকরভাবে ঘটছে। ২০১১ সালে মুসলমান জনসংখ্যা হলো ৩৪.২ শতাংশ অর্থাৎ ১৯৭১ থেকে ১০ বেড়ে গেল। ২০১৮-তে কত জানি না তবে ধরে নেওয়া যায় যে আরও ২ শতাংশ বেড়ে গেছে। সব মিলিয়ে প্রায় ১২ শতাংশ মুসলমান জনসংখ্যার অনুপাত বেড়েছে ১৯৭১ এর পর, বাংলাদেশ গঠন হবার পর। এবার লক্ষ্য করবার বিষয় যে, এন আর সি-র তালিকা অনুযায়ী অনুপ্রবেশকারীর সংখ্যা ৪০ লক্ষের কিছু বেশি যা রাজ্যের জনসংখ্যার ১২ শতাংশ। মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির অনুপাত আর এন আর সি-র সংখ্যার সঙ্গে প্রায় মিলে যাচ্ছে।

এত রক্তক্ষয়ী আন্দোলনের পর একটি গুরুত্বপূর্ণ দাবি জিতেও অসমীয় সমাজ সেকুলার রাজনীতির খেলাতেই মেতে রইল। অসম গণপরিষদের সরকার ও কংগ্রেস তারপর ৩০ বছর ক্ষমতায় থেকেও কাজের কাজ কিছুই করেনি। বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীরা শুধু বহাল তবিয়তেই নেই, বিপুল সংখ্যাবৃদ্ধির জোরে অসমের রাজনীতিতে একটি জোরালো

ভোটব্যাঙ্ক। পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের, বিশেষত উদ্বাস্তু হিন্দুদের মতনই তাদেরও বাংলাদেশি মুসলমানদের হটাতে পঞ্চাশ ষাট দশকের সহিংস বাঙাল খেদাও-এর মতন আন্দোলন করতে সাহসে কুলোয়নি। শেষ পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্টে মামলা করে নাগরিকপঞ্জি নবায়নের কাজে গতি এলো। এর মধ্যে ২০১৫ সালে রাজ্যে প্রথম বিজেপি অগপ মিলিত সরকার এলে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মতো নাগরিকপঞ্জি তৈরির কাজ শেষ হলো। বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ ঠেকাতে এখন ভারতের অন্যান্য রাজ্যও এন আর সি দাবি করছে।

বিদেশি নাগরিকদের চিহ্নিত করাতে কংগ্রেস, সিপিএম, তৃণমূল কংগ্রেসের এত আপত্তি কেন? অসমের বিশেষত বরাক উপত্যকার বামমনস্ক 'বুদ্ধিজীবী'দের এত আপত্তি কেন? এর কারণ— ইতিমধ্যে ৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৫-তে কেন্দ্রে বিজেপি সরকার পাসপোর্ট আইন ও বিদেশি আইন সংশোধন করেছে। এতে বলা হয়েছে যে বাংলাদেশ থেকে আগত সেদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা (হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ইত্যাদি) ভারতে থাকবার আইনি অধিকার পেল। এই আইন সংস্কারে রাষ্ট্রসঙ্ঘের উদ্বাস্তুর সংজ্ঞাকে মান্যতা দেওয়া হয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে একমাত্র অন্য দেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘুরাই উদ্বাস্তুর মর্যাদা পেতে পারেন। এখন সে ৪০ লক্ষ বাংলাদেশিকে চিহ্নিত করা হয়েছে, মনে করা হচ্ছে এর মধ্যে ৩৫ লক্ষ হবে বাংলাদেশি মুসলমান যাদের এদেশে থাকবার কোনও আইনি অধিকার নেই। হিন্দু বাংলাদেশিরা আপাতত নাগরিক না হলেও তাঁরা থাকবেন। ১৯ জুলাই ২০১৬-তে লোকসভায় নাগরিকত্ব সংশোধন বিল ২০১৬ পেশ হয়েছে। এতে বাংলাদেশ থেকে আসা হিন্দু বৌদ্ধদের ভারতীয় নাগরিকত্ব প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সুতরাং বাংলাদেশ থেকে নিপীড়িত হয়ে আসা হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টানদের আতঙ্কের কিছু নেই।

তাহলে প্রতিবাদের কারণ কী? প্রতিবাদ করছেন ভারতে অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশি মুসলমানদের বন্ধু দলগুলি। সংসদে কংগ্রেস, তৃণমূল, সিপিএম প্রতিবাদ জানিয়েছে যার মূল কথা মুসলমানদের বাদ দেওয়া যাবে না। অসমের মতো পশ্চিমবঙ্গের জনগণনার চিত্র দেখলেই বোঝা যাবে পশ্চিমবঙ্গে বাংলাদেশি মুসলমানদের অবাধ প্রবেশের শুরু জ্যোতি বসুর নেতৃত্বে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পর। এই বাংলাদেশি মুসলমানরা ভোট, অস্ত্রশস্ত্র, বোমা, মাদ্রাসা ইত্যাদি নিয়ে তৃণমূল সরকারেরও বড়ো সম্পদ। সুতরাং অসম থেকে বাংলাদেশি মুসলমানদের যদি বিতাড়িত করা যায়, অন্তত তাদের নাগরিকত্ব কেড়ে নিয়ে, ভোটাধিকার ও অন্যান্য সরকারি সুবিধা থেকে বাদ দিয়ে অসমকে নিরাপদ করা যায় তবে পশ্চিমবঙ্গে তা করতে হবে এর পরেই। সেজন্য পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস, তৃণমূল, সিপিএম-এর এত হাহাকার। হাস্যকর প্রতিবাদ করছেন প্রায় পুরোপুরি বাঙালি-অধ্যুষিত বরাক উপত্যকার বামপন্থী 'শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবী'রা।, অসম থেকে স্বাধীনতার সময়ে শ্রীহট্ট জেলা চলে যায় পূর্ব পাকিস্তানে। শ্রীহট্টের তিনটি থানা করিমগঞ্জ, হাইলাকান্দি আর কাছাড় থানা (যা এখন জেলা) যথেষ্ট হিন্দু সংখ্যাধিক্য থাকায় তা ভারতের অসমে যুক্ত হয়, যাকে বলা হয় বরাক উপত্যকা। সেই বরাক উপত্যকায় এখন করিমগঞ্জ ও হাইলাকান্দি থানা মুসলমান প্রধান জেলা এবং বরাক উপত্যকায় ২০১১-র জনগণনায় হিন্দুরা ৫০ শতাংশ এবং মুসলমানরা ৪৮ শতাংশ। ২০১৮-তে এটা নিশ্চিত যে সম্পূর্ণ বরাক উপত্যকা মুসলমান প্রধান হয়ে গেছে। এবং এটা হয়েছে স্রেফ বাংলাদেশি মুসলমান অনুপ্রবেশের জন্য। বরাক উপত্যকা এখন বাংলাদেশের অতিরিক্ত অংশ। সেখানকার সেকুলার হিন্দু বুদ্ধিজীবীরা গলা ফাটাচ্ছেন অনুপ্রবেশকারীদের হয়ে।

পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তরপূর্ব ভারতকে যদি ইসলামি আধিপত্য ও দখলের হাত থেকে বাঁচাতে হয় তবে এন আর সি করে বাংলাদেশি মুসলমানদের চিহ্নিত করে তাদের বিতাড়িত করতে হবে। কোনও ভারতীয় মুসলমানের এতে আতঙ্কিত হবার কিছু নেই। আগামী দিনে নাগরিকত্ব আইন পাশ করে পশ্চিমবঙ্গে এন আর সি চালু করতে হবে। পশ্চিমবঙ্গে অন্তত ৭০ লক্ষ থেকে ১ কোটি বাংলাদেশিকে পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিতাড়িত করতে হবে। তা না হলে পশ্চিমবঙ্গ হবে পশ্চিম বাংলাদেশ। বাঙালি হিন্দুকে ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড, বিহারে আশ্রয় নিতে হবে, যদি অবশ্য তারা দয়া করে স্থান দেয়।

বিজেপি ক্ষমতায় এলে পশ্চিমবঙ্গেও এন আর সি : দিলীপ ঘোষ

অসমে নাগরিক পঞ্জিকরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল কংগ্রেস। সর্বোচ্চ আদালতের তদারকিতে সেই সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হয়েছে। এর জন্য বিজেপি সরকারকে কীভাবে দায়ী করা যেতে পারে? সর্বোচ্চ আদালতের রায়েই বলা হয়েছে, খসড়া তালিকায় যদি কারোর নাম বাদ পড়ে তা হলে অন্তিম তালিকায় তা অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। বাংলাদেশ ও ভারতের সীমান্তবর্তী প্রতিটি রাজ্যে অনুপ্রবেশের সমস্যা রয়েছে। কিন্তু একমাত্র অসমে নাগরিক পঞ্জিকরণ করা হয়েছে। আমরা যদি ক্ষমতায় আসি তাহলে পশ্চিমবঙ্গেও নাগরিক পঞ্জিকরণ করা হবে। তালিকায় যাদের নাম থাকবে না তাদের নিজের দেশে ফেরত পাঠানো হবে। একজন অবৈধ অনুপ্রবেশকারীকেও রেয়াত করা হবে না।

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

অসমের এন আর সি নিয়ে মমতার স্বার্থসিদ্ধির রাজনীতি ভেস্তে গেল

ধর্মানন্দ দেব

লোকসভা ভোটের দামামা বাজতে এখনও দেরি আছে। কিন্তু অসম রাজ্যের এন আর সি নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ বিজেপি বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি আদাজল খেয়ে মাঠে নেমেছে। তথ্যের বিসংগতি ঘটিয়ে এবং মিথ্যা বয়ানবাজি করে এক নিকৃষ্ট রাজনীতি করে চলেছে পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল কংগ্রেস। তারা বাঙালি জিগির তুলে প্রতিনিধি দল পাঠিয়েছিল অসমের বরাক উপত্যকার প্রাণকেন্দ্র শিলচর শহরে। আসলে ওই প্রতিনিধি দলের উদ্দেশ্য ছিল অসমের বাঙালি-অধ্যুষিত বরাক উপত্যকায় প্রবেশ করে বাঙালি-জিগির তুলে পশ্চিমবঙ্গে নিজের দলকে অতি বাঙালি প্রেমী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা এবং অন্যদিকে বিজেপিকে বাঙালি বিরোধী হিসাবে চিহ্নিত করে পশ্চিমবঙ্গে ভোটের বাজারে বাজিমাত করা। কিন্তু অসমের শিলচর শহরের প্রশাসন তাদের কুটচাল ভেস্তে দেয়। তাদের আটকে দেয় বিমানবন্দরের ভিতরেই। এমনকী তারা এক বিলাসী রাত্রিযাপন করেন প্রশাসনের সৌজন্যে শিলচর বিমানবন্দরের ভিতরেই। যাক, আসল সত্যটা কী অর্থাৎ এন আর সি নিয়ে অসমের গ্রাউন্ড রিয়োলিটি কী সে বিষয়ে কিছুটা আলোকপাত করে নেওয়া যাক।

গত ৩০ জুলাই রাষ্ট্রীয় নাগরিক পঞ্জির চূড়ান্ত খসড়া প্রকাশ পেয়েছে অসম রাজ্যে। সকলেই জানে স্বাধীন ভারতে ১৯৫১ সালে প্রথম জনগণনার কাজ আরম্ভ হয়েছিল। প্রথম জনগণনার কাজ শেষে ১৯৫১ সালে সমগ্র ভারতবর্ষের সঙ্গে সঙ্গে অসমেও শুরু হয় প্রথম রাষ্ট্রীয় নাগরিক পঞ্জিকরণের কাজ। প্রথম ১৯৫১ সালে অসমে রাষ্ট্রীয় নাগরিকপঞ্জি হয়েছিল ওই সালের জনগণনার উপর ভিত্তি করে। এখন প্রায় ৬৭ বছর পরে সেই ১৯৫১ সালের প্রথম রাষ্ট্রীয় নাগরিক পঞ্জির উন্নীতকরণের জন্য চূড়ান্ত খসড়া সুপ্রিমকোর্টের নির্দেশে ও তত্ত্বাবধানে প্রকাশ হয়েছে দেশের মধ্যে প্রথম অসম রাজ্যে। সত্যি এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এই গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপে পৌঁছতে গিয়ে ১,২২০ কোটি টাকা ব্যয় হয়। ছোটো-বড়ো মিলিয়ে মোট ৫১টি সফটওয়ার তৈরি করে এন আর সি কর্তৃপক্ষ। প্রায় ২.০১ কোটি লিগেসি কোড তৈরি করা হয়। ২.১ কোটি মানুষের লিগেসি ডাটা ডিজিটালাইজ করা বিশ্বের মধ্যে সর্ববৃহৎ ডিজিটালাইজেশন হিসাবে ইতিমধ্যে চিহ্নিত হয়েছে। মোট ৩ কোটি ২৯ লক্ষ ৯১ হাজার ৩৮৪ জন আবেদনকারী ছিলেন। এই আবেদনকারীরা নিজ নিজ আবেদনের সঙ্গে ৬ কোটি ৫৬ লক্ষ নথি প্রদান করেছিলেন। উল্লেখ্য, অনলাইন মাধ্যমে এন আর সি কর্তৃপক্ষ মোট ৩.০১ লক্ষ আবেদনপত্র গ্রহণ করেন। বিশ্বের মোট ৩৭টি দেশে ৪০২টি নথি পরীক্ষণের জন্য পাঠানো হয়েছিল। পরিশেষে ২ কোটি ৮৯ লক্ষ ৮৩ হাজার ৬৭৭ জনের নাম সন্নিবেষ্টিত করে প্রকাশ পায় চূড়ান্ত খসড়া। অর্থাৎ ৮৭.৬৪ শতাংশ লোকের নাম অন্তর্ভুক্ত হয় পূর্ণাঙ্গ খসড়া এন আর সি-তে। এই ঐতিহাসিক তথা গুরুত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিলেন ৬২ হাজার ৬১৪ জন সরকারি ও বেসরকারি কর্মচারী। তার মধ্যে ছিলেন সরকারি কর্মচারী ৫২ হাজার ৩৮ জন, ১,২০১ জন ছিলেন ঠিকাভিত্তিক কর্মচারি এবং ৯ হাজার ৩৭৫ জন ছিলেন কোম্পানির তরফ থেকে প্রদান করা কর্মচারি। চূড়ান্ত খসড়ায় নাম অন্তর্ভুক্ত হয়নি ৪০ লক্ষ ৭ হাজার ৭০৭ জন লোকের অর্থাৎ ১২.৩৬ শতাংশ লোকের নাম আসেনি চূড়ান্ত খসড়ায়। এই নাম না আসা লোকের মধ্যে ২ লক্ষ ৪৮ হাজার লোকের নাম 'হোল্ড' করে রাখা হয়েছে। কারণ তাঁরা হয়তো 'ডি-ভোটার' বা 'ডি-ভোটারের পরিবার-পরিজন বা বিদেশি ট্রাইবুন্যালে মামলা চলছে। একশো'টি ট্রাইবুন্যাল গঠনের

প্রায় ৪ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেল কিন্তু অসমের 'ডি'-ভোটার সমস্যার সমাধান হচ্ছে না। দুর্ভোগে দিন কাটছে মানুষের। অসমের বিচারের বাণী যেন নিভৃতে কাঁদছে। শুরু হয়েছিল সেই ১৯৯৭ সালের ১২ নভেম্বর (23/AS/56/Vol. 111) নির্বাচন আয়োগের এক পত্র মারফত ভোটার তালিকায় নামের পাশে ডি-ভোটার তকমা লাগানোর কাজ। একদিনও পশ্চিমবঙ্গের কোনো নেতা বা পাতি নেতা, এমনকী পশ্চিবঙ্গের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় টুঁ শব্দ করেননি। ওইসব রাজনৈতিক দলের জন্যই আজও অসমের মানুষকে তার ফলভোগ করতে হচ্ছে। বঞ্চনা, হয়রানি, অপমান এবং মানসিক ও আর্থিক নির্যাতনের শিকার হতে হচ্ছে। আচ্ছা বলুন তো, এখনও পর্যন্ত অনেকেই ফরেনার্স ট্রাইবুন্যাল থেকে ডি-তকমা মুক্ত হয়েছেন কিন্তু যারা এই ডি-তকমা লাগিয়েছিলেন তারাই আবার নানা অজুহাতে সেই 'ডি-ভোটার' তকমা মুছে দিচ্ছেন না। শুধু টার্গেটে পৌঁছানোর জন্যই কি নানা অজুহাত তৈরি করে রাখা হয়েছে। দীর্ঘ ২০ বছর থেকে ভোটার তালিকায় 'ডি' তকমা লাগানো। খুঁজে পাচ্ছেন না মামলা নম্বর। পাচ্ছেন না ট্রাইবুন্যাল থেকে নোটিশ বা সমন। তাই মানুষ একপ্রকার দিশেহারা। প্রায়ই ভিন্ন ভিন্ন মর্মান্তিক দৃশ্য সামনে আসছে। রেহাই নেই ৯ বছরের শিশু থেকে ১০৯ বছরের বৃদ্ধ মানুষের। 'ডি'-তকমাধারী ব্যক্তির সন্তান-সন্ততিরা পাচ্ছে না পি আর সি। ডাক্তারি-ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে পারছে না। পাচ্ছে না কোনও চাকরি-বাকরি। এমনকী অনেকে দূর-দূরান্ত ভ্রমণ করতে পারছে না। ইচ্ছে হলেও ভালো নামি-দামি হোটেলে রাত্রিবাস করতে পারছে না। পাচ্ছে না ড্রাইভিং লাইসেন্স। সমস্ত সরকারি সুযোগ-সুবিধা থেকেও বঞ্চিত হচ্ছে। বছরের পর বছর ধরে কী নিদারুণ পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে দিন কাটাচ্ছে এই মানুষগুলো, তা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন। আর এখন নাম আসছে না। তার জন্য দায়ী কে। নির্বাচনী আধিকারী নিজের দায়ভার কি এড়িয়ে যেতে পারবেন? তাই যাদের নাম হোল্ড রাখা হয়েছে চূড়ান্ত খসড়ায় তাদের নাম এন আর সি-তে অন্তর্ভূক্ত করতে হলে স্থানীয় প্রশাসনকে মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে এগিয়ে আসতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে মহামহিম ট্রাইবুন্যাল সদস্যদেরও মামলা দ্রুতগতিতে শেষ করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে। নতুবা বিচারের বাণী নিভৃতে কাঁদবে।

উদাহরণস্বরূপ কাছাড়ের নির্বাচনী আধিকারিকের একটি তুঘলকি কাণ্ডের কথা পাঠকদের কাছে তুলে ধরছি— কাটিগড়া বিধানসভার অন্তর্গত জনৈক হিন্দুস্থান টি কোম্পানির শ্রমিক রিনা রী। যার ১৯৬৪ সালের বাগানের শ্রমিক হিসাবে প্রভিডেন্ট ফান্ডে অ্যাকাউন্ট রয়েছে। সেই ব্যক্তির এক ছেলে অসম সরকারের পূর্তবিভাগে ১৯৯১ সাল থেকে স্থায়ী চাকুরি করছেন। ছেলেটির জন্ম হয় ১৯৬৫ সালে। নির্বাচনী আধিকারিকের তরফ থেকে সেই ব্যক্তির নামের পাশে ১৯৯৭ সালে ডি-তকমা লাগিয়ে দেওয়া হয়। ছেলেটি এদিক ওদিক ঘুরে নিজের মামলা নম্বর বা ট্রাইবুন্যালের নোটিশ না পেয়ে তখন বর্ডার পুলিশের কাছে লিখিতভাবে মামলা হয়েছে কি না জানতে চায়। ২০১৫ সালের বর্ডার পুলিশ ওই ব্যক্তির নামে কোনও মামলা নেই বলে লিখিত ভাবে জানায়। কিন্তু আজও ভোটার আই ডি কার্ড নেই। দীর্ঘ ২০ বছর থেকে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারছে না। কিন্তু বাগানের লোক হিসাবে সুপ্রিমকোর্টের নির্দেশ মতে আদি বাসিন্দা হওয়ার কথা। এই হচ্ছে আমাদের কাছাড় জেলার নির্বাচনী আধিকারিক কার্যালয়ের কর্মকর্তাদের মর্জিমাফিক ডি-তকমা লাগানোর নমুনা। নির্বাচনী কার্যালয়ের খামখেয়ালিপনার জন্যই ওই ব্যক্তিকে ডি-ভোটার তকমা সরানোর জন্য এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে। আজ ওই ব্যক্তির নাম নির্বাচনী আধিকারিকের খামখেয়ালিপনার জন্য চূড়ান্ত খসড়ায় নাম অন্তর্ভুক্তি হয়নি। কেমন করে হবে। যতক্ষণ না নির্বাচনী আধিকারিক 'ডি-তকমা' সরাবেন ততক্ষণ পর্যন্ত চূড়ান্ত খসড়ায় নাম আসবে না। তাই নির্বাচনী আধিকারিককে এগিয়ে আসতে হবে। যারা ট্রাইবুন্যাল থেকে 'ডি' তকমার শাপমুক্তি পেয়েছেন তাদের ভোটার তালিকায় থাকা নামের পাশে ডি-তকমাটি সরাতে হবে নির্বাচনী আধিকারিককেই।

বাকি ৩৭ লক্ষ ৫৯ হাজার ৭০৭ জন এন আর সি-র চূড়ান্ত খসড়া ছুটরা সুযোগ নিতে পারবেন পুনরায় দাবি জানানোর। এই দাবি দাখিল করে আবার এন আর সি-র চূড়ান্ত তালিকায় নাম নথিভুক্ত করতে পারবেন। ২০০৩ সালে নাগরিকত্ব (নাগরিকদের পঞ্জিয়ন এবং রাষ্ট্রীয় পরিচয় প্রদান) রুলসের ৪ নম্বর ধারার সঙ্গে '৪-এ' জুড়ে দেওয়া হয়। আর ওই '৪-এ' রুলসের সঙ্গে থাকা তপশিলের ৬ নম্বর প্যারাগ্রাফ অনুসারে প্রয়োজনীয় নথিপত্র নিয়ে অর্থাৎ প্রথমে অন্তর্ভুক্ত না হওয়ার কারণ জেনে সেইমতো অতিরিক্ত নথি বা পূর্বে দাখিল করা নথি-সহ এন আর সি আর-এর নিকট ওজর-আপত্তি দাখিল করতে পারবেন অথবা নির্ধারিত ওজর-আপত্তির ফর্ম পূরণ করে দাখিল করতে হবে। আগামী ১০ আগস্ট থেকে ২৮ সেপ্টেম্বরের মধ্যে নিজ নিজ এন এস

এন আর সি নিয়ে মমতা তোষণের রাজনীতি করছেন : দীপেন পাঠক

(তৃণমূল কংগ্রেসের অসম শাখার প্রাক্তন সভাপতি)

এন আর সি নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুসলমান তোষণের রাজনীতি করছেন। প্রথমেই বলে রাখা ভালো এন আর সি অসমের পক্ষে খুবই দরকারি। এই বিষয়ে প্রতিবাদ প্রতিরোধের কোনও অর্থই হয় না। অসমে প্রতিনিধিদল পাঠানোর আগে মমতা আমার সঙ্গে আলোচনা করেননি। আমি অসম রাজ্য তৃণমূলের প্রধান। দলের একমাত্র বিধায়ক। অথচ মমতা কংগ্রেসের কমলেশ্বর দেব পুরকায়স্থের সঙ্গে আলোচনা করে প্রতিনিধি দল পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন। এবং এটা তিনি করলেন সম্পূর্ণ নিজের রাজনৈতিক স্বার্থে। তাও শুধু পশ্চিমবঙ্গের কথা ভেবে। অসমের জন্য নয়। ব্যক্তিগতভাবে আমার কাছে আগে দেশ, তারপর দল। দলের স্বার্থে দেশকে আমি কোনওদিনই বিকিয়ে দেব না। এন আর সি-র প্রাথমিক তালিকায় অনেক ভুল থাকতে পারে কিন্তু আমি মনে করি পঞ্জিকরণের সিদ্ধান্ত দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক। মমতার বক্তব্যের প্রতিবাদে আমি দল থেকে পদত্যাগ করেছি।

কে-র স্থানীয় পঞ্জিয়কের কাছে আবেদন দাখিল করে জেনে নিতে হবে সম্পূর্ণ খসড়া এন আর সি-তে আপনার নাম অন্তর্ভুক্ত না হওয়ার কারণ। এই আবেদনটিও পাওয়া যাবে আপনার নির্ধারিত এন এস কে-তে। এই ফর্ম আপনি ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করতে পারবেন। ওয়েবসাইটটি হচ্ছে— www.nrcassam.nic.in কারণ জেনে নেওয়ার পর সেই অনুসারে নথিপত্রের ব্যবস্থা করতে হবে। আবেদনের সঙ্গে নথিও জমা দিতে হবে। আগামী ১০ আগস্ট থেকে ২৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মাত্র ৩০ দিন সময় পাওয়া যাবে ওই দাবি-আপত্তির আবেদনপত্র জমা দেওয়ার জন্য। মনে রাখতে হবে, এই ৩০ দিনের যে সময়সীমার কথা বলা হয়েছে সেই সময়সীমা কখনো বাড়বে না। তাই এই সীমিত ৩০ দিনের মধ্যেই দাবির ফর্ম পূরণ করে জমা দিতে হবে নিজ নিজ এ এস কে-তে।

নতুন পশ্চিমবঙ্গ গড়তে হলে বাংলাদেশি অবৈধ অনুপ্রবেশকারী অর্থাৎ বাংলাদেশি মুসলমান বিতাড়ন করে পশ্চিমবঙ্গে এন আর সি নবায়ন হওয়া উচিত।

অসমের বরাক উপত্যাকার তিন জেলার মধ্যে কাছাড়ে নাম নথিভুক্তের জন্য আবেদনকারী ছিলেন ১৮ লক্ষ ১৯ হাজার ৭০২ জন। তার মধ্যে প্রকাশিত চূড়ান্ত খসড়ায় নাম এসেছে ১৫ লক্ষ ৯০ হাজার ১৪০ জনের। অর্থাৎ বাদ পড়েছেন ২ লক্ষ ২৮ হাজার ৭৬২ জন। করিমগঞ্জে মোট আবেদনকারী ছিলেন ১৩ লক্ষ ২৪ হাজার ৯৬ জন এবং তার মধ্যে প্রকাশিত চূড়ান্ত খসড়ায় নাম এসেছে ১২ লক্ষ ১১ হাজার ৯৮৭ জনের অর্থাৎ চূড়ান্ত খসড়ায় নাম আসেনি ১ লক্ষ ১২ হাজার ১০৯ জনের।

বরাক উপত্যকার হাইলাকান্দি জেলায় মোট আবেদনকারী ছিলেন ৭ লক্ষ ৭ হাজার ৮৫৭ জন এবং চূড়ান্ত খসড়ায় নাম আসেনি ৫৪ হাজার ৫৬০ জন লোকের। অন্যদিকে আমাদের বরাক উপত্যকার পার্শ্ববর্তী পাহাড়ি জেলাগুলির দিকে চোখ বোলাই তখন দেখা যাবে কার্বি আংলং জেলায় মোট আবেদনকারী ছিলেন ৬ লক্ষ ৮৪ হাজার ৯০৫ জন এবং চূড়ান্ত খসড়ায় নাম আসে ৫ লক্ষ ৮৬ হাজার ৭১৩ জনের। অর্থাৎ নাম আসেনি ৯৮ হাজার ১৯২ জন লোকের। পশ্চিম কার্বি আংলং জেলায় মোট আবেদনকারী ছিলেন ৩ লক্ষ ১৫ হাজার ৮৫৯ এবং চূড়ান্ত খসড়ায় নাম অন্তর্ভুক্ত হয় ২ লক্ষ ৯৩ হাজার ৫০২ জন লোকের অর্থাৎ ২২ হাজার ৩৫৭ জন লোকের নাম চূড়ান্ত খসড়ায় অন্তর্ভুক্ত হয়নি। ডিমা হাসাও জেলায় মোট আবেদনকারী ছিলেন ২ লক্ষ ৮ হাজার এবং চূড়ান্ত খসড়ায় নাম আসে ১ লক্ষ ৭৪ হাজার ৫৭৫ জন লোকের অর্থাৎ চূড়ান্ত খসড়ায় নাম আসেনি ৩৩ হাজার ৪২৫ জনের।

যাক, এখন হয়তো অনেকেই ভাবছেন যে এই ৪০ লক্ষ ৭ হাজার ৭০৭ জন আবেদনকারীর নাম চূড়ান্ত খসড়ায় অন্তর্ভুক্ত হয়নি তারা কি সবাই বিদেশি? এক কথায় উত্তর দিয়ে বলা যায়— 'না'। বিদেশির প্রকৃত সংখ্যা জানতে হলে অপেক্ষা করতে হবে চূড়ান্ত এন আর সি-র তালিকা প্রকাশ পর্যন্ত। কেননা আগামী ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে অসমে ১৯৫১ সালের এন আর সি নবায়ন পক্রিয়া শেষ হবে। ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের পক্ষ থেকে একটি নোটিফিকেশন ইস্যু করে এই কথা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাই একাংশ যে টার্গেট মাথায় রেখে এই এন আর সি নবায়ন প্রক্রিয়াকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন এবং চূড়ান্ত খসড়া প্রকাশ হওয়ার পর ৪০ লক্ষ টার্গেটে পৌঁছে গেছেন বলে যারা মিষ্টিমুখ করছেন আসলে তারা মূর্খের স্বর্গে বাস করছেন। কারণ দাবি, আপত্তি ও সংশোধনী প্রক্রিয়া শেষে দেখা যাবে বাদ পড়া ৪০ লক্ষ ৭ হাজার ৭০৭ জন আবেদনকারীর মধ্যে অধিকাংশের নাম এসে গেছে। তখন টার্গেট নিয়ে চলা লোক বা দোকানদারদের কী হবে? তাদের মুখে চুন-কালি পড়বে কি? তাদের দোকান বন্ধ হবে কি? প্রশাসন তার পরেও কি এইসব দোকানদারদের কথায় চলাফেরা করবে? তার উত্তর সময়েই পাওয়া যাবে। ছোট্ট এক নিঃশ্বাস নিয়ে বলা যায় ১৯৫১ সালের ন্যাশনাল রেজিস্টার অব সিটিজেনশিপ নবায়নের জন্য ৬৭ বৎসর পর চূড়ান্ত খসড়া প্রকাশ করে এক ধাপ এগিয়ে গেল অসম।

চূড়ান্ত এন আর সি প্রকাশকে ভেস্তে দেওয়ার জন্য পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল কংগ্রেস সহ বিজেপি বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি মিথ্যা তথ্য পরিবেশন করে অসম রাজ্যকে কলুষিত করার কাজে লিপ্ত হয়েছে। এটা তৃণমূল কংগ্রেসের এক অনাধিকার চর্চা বলা যায়। আসলে বাংলাদেশি মুসলমানদের পশ্চিমবঙ্গে সুরক্ষা দেওয়া ও ভোটব্যাঙ্কের জন্যই দিদির দল অসমে অনাধিকার প্রবেশ করে এন আর সি-র কাজ ভেস্তে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু অসমের বাঙালি নাগরিকরা দিদির পাতানো ফাঁদে পা দেননি। পিছন থেকে গোপনে সিপিএম ও কংগ্রেস দিদির দলকে মদত করেছিল। তবুও সফলতা লাভ করতে পারেনি। বরং সরকারি কর্মচারীকে কাজকর্মে বাধা প্রদানের অপরাধে অসমের শিলচর সংলগ্ন উধারবন্দ থানায় একটি মামলা রুজু হয়। মমতা দিদির রাজনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধি সম্পূর্ণ ভাবে ভেস্তে দিয়েছে অসমের বাঙালি সমাজ। শুধু তাই নয়, তৃণমূল কংগ্রেসের একটু-আধটু ফাঁকা আওয়াজ এবং কাগুজে সংগঠন ছিল অসমে সেটাও এন আর সি নিয়ে মমতা দিদির অনাধিকার চর্চায় ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে।

দিদির রাজ্যেও মূল সমস্যা কিন্তু সেই অবৈধ অনুপ্রবেশকারী। তাই অসমের সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গেও এন আর সি হওয়া প্রয়োজন। আর এন আর সি পশ্চিমবঙ্গে মমতা দিদির সরকারে হবে না। কেননা ওই সরকার মৌলবাদীদের হাতের পুতুল হয়ে বর্তমানে রাজ্যে সরকার পরিচালনা করছে। নতুন পশ্চিমবঙ্গ গড়তে হলে বাংলাদেশি অবৈধ অনুপ্রবেশকারী অর্থাৎ বাংলাদেশি মুসলমান বিতাড়ন করে পশ্চিমবঙ্গে এন আর সি নবায়ন হওয়া উচিত। মমতা দিদির রাজনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধি ভেস্তে দিয়েছে অসমের বাঙালি সমাজ। সেই একই ভাবে পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিদের জাগরণ প্রয়োজন। পশ্চিমবঙ্গকে বাঁচাতে সরকার বদল করে শীঘ্রই এন আর সি নবায়ন হওয়া দরকার।

(লেখক পেশায় আইনজীবী)

মিলন তিথি ঝুলন

নন্দলাল ভট্টাচার্য

'আমাতে প্রাণেতে খেলিব দুজনে ঝুলনখেলা/নিশীথ বেলা।' কবির এ আকুতি প্রেয়সীর সঙ্গে পরমরসে প্রেমকেলিতে মত্ত হওয়ার। অথচ এরই আড়ালে রয়েছে জীবন-মরণের সীমানা ছাড়িয়ে পরমের সঙ্গে মিলনের এক অধ্যাত্ম-ভাবনাও। বস্তুত, ঝুলন বা দোলায় দুলে জীবনের চরম অর্থটি অনুভবের এক বিপুল প্রয়াস লুকিয়ে আছে ভারতীয় চেতনায়। সেই চেতনারই রূপকল্প ঝুলন উৎসব।

ঝুলন শব্দটির অর্থ দোলন। ঝুলা বা দোলায় বসে পুরুষ ও প্রকৃতির দোল খাওয়ার এ এক রঙ্গ। ঝুলন তাই উৎসব অঙ্গে হিন্দোল নামেই সুচিহ্নিত।

প্রবল গ্রীষ্মের খরতাপে দগ্ধ পৃথিবী যখন বর্ষার স্নিগ্ধ ধারায় সুস্নাত, তেমনই শ্রাবণ বেলায় কৃষ্ণ-রাধিকার এক মিলনকে কেন্দ্র করেই প্রবর্তন ঝুলনের। অনেকে মনে করেন, ঝুলন বা হিন্দোলযাত্রার প্রচলন শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান হিসেবে নয়, এর লৌকিক দিকটাই প্রধান। এ ধারণা হয়তো আংশিক সত্য, তবে এক সংকীর্ণ অর্থে। বাস্তবে এই উৎসবের মূল বস্তু রয়ে গিয়েছে ভাগবত এবং অন্যান্য পুরাণের পাতায়। ঝুলন বা হিন্দোল এক অর্থে পুরুষ ও প্রকৃতির মিলনোৎসব। দুয়ের এক হওয়ার উৎসব। বাস্তবে ভারতীয় চেতনায় সকলের সঙ্গে সকলের একাত্ম হওয়ার উৎসব।

স্মৃতিশাস্ত্রগুলিতে যেভাবে হিন্দোল উৎসব পালনের তেমন কোনো উল্লেখের অভাব অনেকেরই চোখ পড়ে। এমনকী পূজা পদ্ধতির সাধারণ গ্রন্থেও আলাদা করে এই পূজার উল্লেখ পাওয়া যায় না।

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ-রাধিকার প্রেমলীলা আস্বাদনের আধার হিসেবে এই উৎসব বৈষ্ণবদের কাছে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। রাস ও দোললীলার পরই ঝুলন বা হিন্দোলের গুরুত্ব বৈষ্ণবদের কাছে এটি সবচেয়ে বড়ো রমণীয় এবং তাৎপর্যবহ একটি উৎসব। এই উৎসবকে কেন্দ্র করেই বৃন্দাবন-মথুরাসহ দেশের নানা প্রান্ত মেতে ওঠে আনন্দে-উৎসবে, অর্চনা-ভজনায়। কীর্তনে-নৃত্যে শ্রাবণের শুক্লা একাদশী থেকে পূর্ণিমা পর্যন্ত পালন করা হয় এই পূজা-উৎসব।

বৈষ্ণবীয় মহাগ্রন্থ 'হরিভক্তি বিলাস'-এ কৃষ্ণভজনার অন্যতম অনুষ্ঠান হিসেবে চিহ্নিত এই ঝুলন বা হিন্দোল। 'হরিভক্তি বিলাস'-এ আছে গ্রীষ্ম তাপে-তাপিত শ্রীকৃষ্ণ-রাধিকাকে স্নিগ্ধ করতে বৈশাখে হয় 'চন্দনযাত্রা'। চন্দনে চর্চিত করা হয় রাধা-কৃষ্ণ বিগ্রহকে। নৌকা বিহারের মাধ্যমে চেষ্টা করা হয় তাঁদের শ্রান্তি অপনোদনের। এরই পরিণতি হিসেবে শ্রাবণে দোলায় দুলিয়ে পালন করা হয় হিন্দোলযাত্রা বা ঝুলন উৎসব।

ভাগবত, হরিবংশ প্রভৃতি গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় লীলা বর্ণনা প্রসঙ্গে রয়েছে বর্ষার সময় মধুবনে কদম্ববৃক্ষে দোলনা টাঙিয়ে শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর সখা-সখীদের দোলনের কথা। গোচারণের ফাঁকে যা ছিল তাঁদের ক্রীড়াকৌতুকের উৎসব, তারই সূত্র ধরে ঝুলন বা হিন্দোলনের প্রবর্তন, এমনটাই মনে করা হয়।

ভাগবতে রাধার উল্লেখ না থাকলেও রয়েছে শ্রীকৃষ্ণের এক প্রধানা সখীর

কথা। কৃষ্ণ এবং তাঁর সেই প্রধানা সখীকে দোলায় বসিয়ে গোপবালক-বালিকারা মেতে উঠত নানা ক্রীড়ারঙ্গে।

এক পুরা-কাহিনিতে আছে, একদিন কিশোরী রাধিকাকে দোলায় বসিয়ে দোল দিতে থাকেন শ্রীকৃষ্ণ। প্রথমে আস্তে আস্তে। কিন্তু রাধিকার কথাতেই এক সময় প্রচণ্ড গতিতে দোলা দিতে থাকেন শ্রীকৃষ্ণ। ভয় পেয়ে আর্ত চিৎকার করতে থাকেন রাধা— মিনতি করেন দোলার গতি কমানোর।

রাধার ওই ভয় দেখে আনন্দ কৃষ্ণের। তাই দোলার গতি তো কমলই না, বরং আরও জোরে দোল দিতে দিতে নিজেই উঠে বসেন দোলায়। ভয়ে জড়িয়ে ধরেন রাধিকা। আরও কৃষ্ণও পরম আশ্লেষে বদ্ধ করেন রাধিকাকে। ঘটে পুরুষ ও পরমাপ্রকৃতির পরম মিলন। বৈষ্ণবসাধকরা সেই পরম মিলনের রসাস্বাদনের জন্যই যুগলবিগ্রহকে দোলায় চাপিয়ে পালন করেন ঝুলন উৎসব।

ঝুলন বা হিন্দোল উৎসব সাধারণত এক সপ্তাহ ধরে পালন করা হয়। তবে এই উৎসবকে কেন্দ্র করে বৃন্দাবনে রাধাষ্টমী পর্যন্ত একমাস চলে ঝুলন মেলা। পুরীতে শুক্লাদশমী থেকে এক সপ্তাহ হল এই ঝুলন মেলার কাল। দেশের নানান প্রান্তেই ঝুলন উপলক্ষ্যে সপ্তাহ, পক্ষ অথবা একমাস ধরে চলে উৎসব-মেলা।

বৈষ্ণবীয় গ্রন্থগুলি থেকে জানা যায়, গন্ধর্বরাও রাধা-কৃষ্ণকে দোলায় বসিয়ে ঝুলন উৎসব পালন করতেন।

ঝুলন বা হিন্দোল যাত্রায় রয়েছে নানা অঙ্গ। এর মুখ্য অনুষ্ঠান রাধা-কৃষ্ণের পূজা অর্চনা। এটিই এর আনুষ্ঠানিক বা ধর্মীয় দিক। আবার এই উৎসবকে কেন্দ্র করে একই সঙ্গে সূচিত হয় সাহিত্য-সংস্কৃতির একটি ধারারও পরিপুষ্টি। ঝুলন এবং রাধা-কৃষ্ণর এই পরমমিলনকে কেন্দ্র করে বৈষ্ণবীয় সাধক এবং পদর্কতারা রচনা করেছেন এমন অপূর্ব সব পদাবলি যা সুসমৃদ্ধ করেছে সাহিত্যের ধারাকে। পদাবলি কীর্তনের একটি ধারার শ্রীবৃদ্ধি ঘটাছে ঝুলন উপলক্ষ্যে রচিত নানা পদকীর্তনে। আজও কবি ও পদকর্তারা একইভাবে রাধা-কৃষ্ণ প্রেমলীলা নিয়ে রচনা করে চলেছেন অসংখ্য পদ।

সাহিত্যের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই ঝুলনকে কেন্দ্র করেই বসে কীর্তন, ভজন গানের আসর। অভিনীত হয় রাধা-কৃষ্ণলীলা সংবলিত নানা নাটক। তারই মধ্য দিয়ে নাটক, অভিনয় এবং সংগীতের ধারাটিও নানাভাবে বিকশিত হয়ে ওঠে।

ঝুলনের এই ধর্মীয় বা পূজার্চনার দিক ছাড়া রয়েছে একটি লৌকিক অঙ্গও। এই উৎসবকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন জায়গায় বসে নানা মেলা। সেখানে প্রদর্শিত হয় দেশজ শিল্পের নানা নিদর্শন। এর মধ্য দিয়ে স্থানীয় কুটির ও দেশীয় শিল্পের সঙ্গে পরিচিত হতে পারেন সাধারণ মানুষ। সেইসঙ্গে এই শিল্পের অর্থনৈতিক দিকটিরও ঘটতে থাকে উন্নয়ন। সব মিলিয়ে এইসব মেলা বিশেষ করে গ্রামীণ অর্থনীতির ভিতটিকে শক্ত করার ক্ষেত্রে একটি কার্যকর ভূমিকা নেয়। অর্থাৎ ঝুলন বা হিন্দোল ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে সামগ্রিকভাবে সামাজিক ক্ষেত্রেও নেয় এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। শুধু তাই নয়, এই মেলার মধ্য দিয়ে ঘটে মানুষের মনের মিলন। গড়ে ওঠে একাত্মতা। যা পরিশেষে দৃঢ় করে জাতীয় সংহতিকেই। হিন্দুর পূজা-উৎসবের এটাই বৈশিষ্ট্য।

ঝুলন উৎসবকে কেন্দ্র করে বঙ্গদেশে ছোটো ছোটো ছেলে-মেয়েরা মেতে ওঠে ঝুলন সাজানোয়। এই ঝুলন সাজানোর মধ্য দিয়ে বিকাশ ঘটে তাদের সৃজন শক্তির। শিল্প সৃষ্টির প্রতি বাড়ে তাদের আগ্রহ। অর্থাৎ একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান এইভাবে শিশু-কিশোর মানসের প্রকাশ ও পরিপূর্ণতার একটি দুয়ার উন্মোচন করে।

ঝুলন উৎসবের শেষ অর্থাৎ পূর্ণিমার দিনটি উত্তরভারতে রক্ষাবন্ধন বা রাখিবন্ধন হিসেবে পালিত হয়। বঙ্গদেশেও দিনটি এখন একইভাবে পালিত হয়। তবে বঙ্গভঙ্গের সময় যে রাখিবন্ধন উৎসবের সূচনা হয়েছিল তার সময় ও প্রেক্ষিত ছিল ভিন্ন। ১৩১২ সালের ৩০ আশ্বিন, বীরাষ্টমী উপলক্ষ্যে আশ্বিনের শুক্লা অষ্টমীতে পালিত হয় সেই রাখি-উৎসব। একাত্মতার প্রতীক হিসেবে হাতে বাঁধা হয় হলুদ সুতো। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন এর অন্যতম উদ্যোক্তা।

এই প্রসঙ্গে বলা দরকার, হিন্দুর রক্ষাবন্ধন উৎসবের সঙ্গে দানবরাজ বলির কোনো প্রত্যক্ষ যোগ না থাকলেও রক্ষাবন্ধনের মন্ত্রে কিন্তু বলা হয়— 'যেন বদ্ধো বলিরাজা দানবেন্দ্রঃ মহাসুরঃ। তেন ত্বাং প্রতিবধ্নামি রক্ষে মা চল মা চল।।"

কেরলের মানুষের বিশ্বাস, বলি ছিলেন কেরলের রাজা। বামনরূপী বিষ্ণুকে ত্রিপাদ ভূমি দান করতে গিয়ে তিনি সর্বস্ব হারিয়ে পাতালে বদ্ধ হন। কিন্তু তাঁর এই রাজ্যের কথা ভুলতে পারেন না বলে শ্রাবণ পূর্ণিমার কিছু পরেই একবার তাঁর রাজ্য পরিদর্শনে আসেন। আর এই উপলক্ষ্যেই সেখানে পালিত হয় ওনম উৎসব।

মুম্বই ও মহারাষ্ট্রে এই শ্রাবণ পূর্ণিমায় সমুদ্রপূজা করে সমুদ্রে ভাসানো হয় নারকোল। অনেকটা বঙ্গের আমবারুণীর মতোই। সেখানে দিনটির অন্য নাম নারিকেল দিবস।

ভারতের উচ্চবর্ণের বহু মানুষ এই শ্রাবণী পূর্ণিমার নতুন উপবীত ধারণ, দেবতা ও পিতৃপুরুষের তর্পণ, শ্রাদ্ধ ইত্যাদি উপাকর্ম বা ধর্মীয় আচার পালন করেন। দক্ষিণ ভারতে এটি আবলি অবিত্তম্ নামে পরিচিত। গোভিল গৃহ্যসূত্র ইত্যাদির উল্লেখ থেকে বোঝা যায় বৈদিক যুগ থেকে এটি প্রচলিত। সবমিলিয়ে ঝুলন বা হিন্দোল কোনো সম্প্রদায় নয়, সারা ভারতেরই একটি আন্তরিক উৎসব— প্রাণের অনুষ্ঠান। ■

বাঙালিদের রক্ষাবন্ধন

রঞ্জন সরকার

রক্ষাবন্ধন বাঙালিদের কাছে রাখিবন্ধন নামে পরিচিত। রাখি পরানোর সময় বোনেরা ভগবানের কাছে ভাইয়ের মঙ্গলময় জীবন প্রার্থনা করেন এবং সমাজের অশুভ শক্তির থেকে নিজের সম্মান রক্ষা ও বাঁচার অধিকার ভাইয়ের কাছে চেয়ে থাকেন। ভারতীয় পরম্পরার মূল স্তম্ভ হলো বিশ্বাসের বন্ধন। এই বন্ধন রক্ষা করার একটি বিশেষ মাধ্যম হলো রাখিবন্ধন। রাখি পরার পর ভাইরা বোনদের অশুভ শক্তির হাত থেকে

রক্ষা করার প্রতিজ্ঞা করেন। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ এই উৎসবটিকে একটি জাতীয় রূপ দিয়েছে। সমাজের সুরক্ষা নির্ভর করে সমাজের পারস্পরিক ঐক্য ও সংগঠনের উপর। একতা ও সংগঠন সম্ভবপর হয় সমাজে মানুষের অকৃত্রিম ভালোবাসায়। সঙ্ঘকার্যের আধার হলো সমাজের প্রতি অকুণ্ঠ-অকৃত্রিম স্নেহ ভালোবাসা ও ভক্তি ভাব।

একশত যজ্ঞ সম্পূর্ণ করার পর দানবরাজ বলির স্বর্গ জয়ের লালসা জাগ্রত হয়। দেবরাজ ইন্দ্রের কাছে এই সংবাদ পৌঁছলে তিনি অত্যন্ত চিন্তায় পড়ে যান। অতঃপর ভগবান বিষ্ণুর কাছে গিয়ে ইন্দ্র দেবলোক ও দেবতাদের নিরাপত্তার আর্জি জানান। ভগবান বিষ্ণু তখন ব্রাহ্মণ বেশে দানবরাজ বলির সম্মুখে উপস্থিত হয়ে ভিক্ষা স্বরূপ 'তিন পা' জমি চেয়ে বসেন। ব্রাহ্মণদেবকে খালি হাতে ফেরানো অধর্ম হয়, তাই দানবরাজ বলি গুরু শুক্রদেবের অমত সত্ত্বেও জমি দানের কথা দেন। শুক্রদেব ব্রাহ্মণদেব রূপী ভগবান বিষ্ণুকে চিনতে পেরে দানবরাজ বলিকে তা জানান। কিন্তু দানবরাজ বলি ব্রাহ্মণদেব রূপী ভগবান বিষ্ণুকে তার ইচ্ছামত 'তিন পা' জমি চাইতে বলেন। এরপর বিষ্ণু এক পা পৃথিবীতে, অন্য পা স্বর্গে রেখে তা ফিরিয়ে নেন। তৃতীয় পা রাখার জন্য সমান জমি না মেলায় দানবরাজ বলি নিজের মাথা পেতে দেন। বলির মাথায় ভগবান বিষ্ণু পা রাখতেই তিনি পাতাল লোকে পৌঁছান। এই ভাবে ভগবান বিষ্ণু ত্রিভুবন (স্বর্গ-মর্ত-পাতাল)-কে রক্ষা করেন। ভগবান বিষ্ণুর পাতাল প্রবেশ হবার পর দানবরাজ বলি সেবা ও ভক্তি বন্দনায় বিষ্ণুকে আবদ্ধ করে রাখেন এবং কথা আদায় করে নেন বিষ্ণু যেন তাঁর দ্বার রক্ষী হিসাবে তাঁর সঙ্গেই থাকেন। এই দিকে বিষ্ণুর অভাব বোধ বৈকুণ্ঠলোকে দেখা দিলে দেবী লক্ষ্মী নারদ মুনীর কাছে জানতে পারেন যে বিষ্ণু পাতাললোকে বলির দ্বাররক্ষী হিসাবে বচনবদ্ধ অবস্থায় আছেন। নিজের দুঃখ আর বৈকুণ্ঠলোকের ভবিষ্যতের কথা ভেবে অস্থির হয়ে দেবী লক্ষ্মী নারদ মুনীর পরামর্শমতো পাতাললোকে গিয়ে ভাই বলে সম্বোধন করে দানবরাজ বলিকে রাখি পরান। এই ভ্রাতৃত্ব গ্রহণ করে উপহার স্বরূপ দানবরাজ বলি দেবী লক্ষ্মীর ইচ্ছানুসারে ভগবান বিষ্ণুকে তাঁর হাতে ফিরিয়ে দেন। এই দিনটিতে ছিল শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমা।

দ্বাপর যুগে অর্থাৎ মহাভারত যুগেও রাখি বন্ধনের উল্লেখ পাওয়া যায়। শিশুপালকে বধ করার সময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আঙুল কেটে যায়। দ্রৌপদী নিজের শাড়ির আঁচলের অংশ ছিঁড়ে শ্রীকৃষ্ণের আঙুলে জড়িয়ে বেঁধে দিলে রক্তপাত বন্ধ হয়। আর এই বন্ধনের উপহার হিসেবে শ্রীকৃষ্ণ কুরু রাজসভায় বস্ত্রহরণের সময় দ্রৌপদীর সম্মান রক্ষা করেন। এই দিনটিও ছিল শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমার দিন।

ভারতের পরম্পরাগত ইতিহাসেও রাখি বন্ধনের অনেক ঘটনার উল্লেখ আছে। যেমন বিশ্ব জয়ের ইচ্ছা নিয়ে আলেকজান্ডার দক্ষিণ পশ্চিম এশিয়ার অনেক রাজ্য জয় করে এসে রাজা পুরুর কাছে বাধা পান। রাজা পুরুর ক্ষমতা ও সেনাবল দেখে আলেকজাণ্ডারের স্ত্রী বিচলিত হন। ভারতের সংস্কার সম্পর্কে জানতে পেরে তিনি রাজা পুরুর হাতে রাখি পরিয়ে আলেকজান্ডারের প্রাণ ভিক্ষা চেয়েছিলেন।

একবার চন্দ্রশেখর আজাদ ইংরেজ সেনার চোখে ধুলো দিয়ে পালানোর সময় এক বাড়িতে আশ্রয় নেন। সেই বাড়িতে এক বিধবা মা তার বিবাহযোগ্যা কন্যাকে নিয়ে বসবাস করতেন। তাদের মুখে সংসারের করুণ কাহিনি জানতে পেরে বিধবা মাকে বলেন যে— ইংরেজ সেনার হাতে তাকে ধরে তুলে দিতে। এতে পুরস্কার স্বরূপ তিনি পাঁচ হাজার টাকা পাবেন, আর তা দিয়ে তিনি যেন মেয়ের বিয়ে দেন। একথা শোনার পর বিধবা মা বলেন 'তোমাদের মতো দেশভক্ত সন্তানরা নিজের সর্বস্ব ত্যাগ করে দেশের স্বাধীনতার জন্য ইংরেজদের সঙ্গে লড়াই করছো। আর তোমাদের জন্যই আমরা সুরক্ষিত এবং সম্মানের সঙ্গে বেঁচে আছি। তাই এ কাজ আমি মরে গেলেও পারবো না।' একথা শেষ করে তিনি চন্দ্রশেখর আজাদের হাতে এক গুচ্ছ সুতো পরিয়ে দেন। গভীর রাতে চন্দ্রশেখর আজাদ সে বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার সময় পাঁচ হাজার টাকা বালিশের নীচে রেখে যান এবং একটি চিরকুটে লিখে যান 'আমার প্রিয় বোনের জন্য উপহার স্বরূপ এই অর্থ রেখে গেলাম।'

ভারত মায়ের বিভাজনের চক্রান্ত করে ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের আদেশ দেন সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ শাসক কার্জন। এর বিরুদ্ধে সারা দেশে বিক্ষোভ আন্দোলন শুরু হয়েছিল। ঠিক এই সময়ে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দেশের মানুষদের ভ্রাতৃত্ববোধে উদ্বুদ্ধ করে এক মানবিক বন্ধনে আবদ্ধ হবার ডাক দেন। তিনি তখন রাখির মাহাত্ম্যকে উপলব্ধি করে ১৬ অক্টোবর রাখি বন্ধন উৎসব পালন করেন। ▮

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩

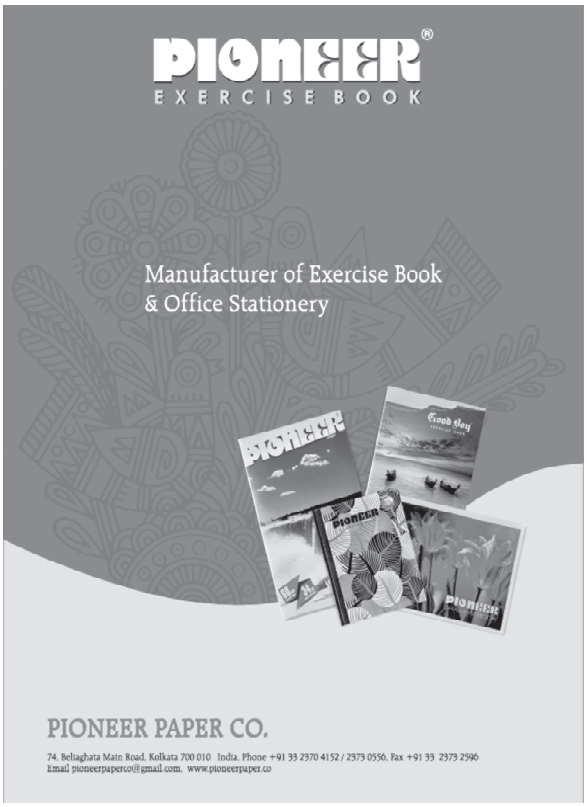

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

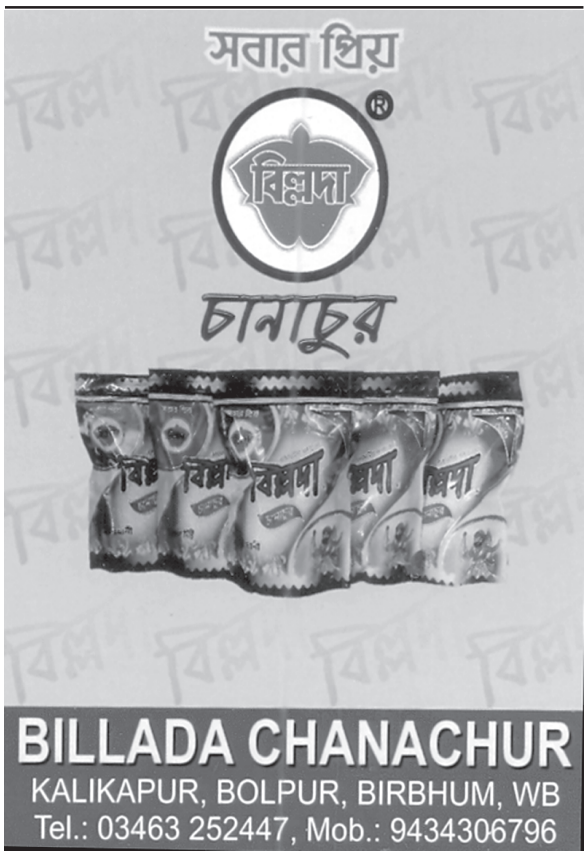

নুটুবিহারী

সন্দীপ চক্রবর্তী

—আমি ভেবেছিলাম আপনি বোধহয় আসবেন না।

আপনি যেরকম ঘ্যান ঘ্যান শুরু করেছেন, না এসে উপায় কী! বলুন, কী বলবেন?

—বলছি। আগে দু-কাপ কফি বলি। এই কফিশপটা নতুন হয়েছে। দারুণ কফি বানায়।

—শুধু কফি। আমি স্ট্রিক্ট ডায়েটে থাকি। যখন তখন যা তা খাই না।

—আচ্ছা নীলাঞ্জনা, আপনার মেজাজ কি বরাবরই এরকম কড়া? মানে, আপনি কি নরম গলায় কথা বলতে পারেন না? বললে কিন্তু সেটা একটা দারুণ অভিজ্ঞতা হতো।

—বোর করবেন না তো। আমার হাতে সময় বেশি নেই। এখান থেকে ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে যেতে হবে।

—আপনার সেই রিসার্চের জন্য বুঝি? কী নিয়ে যেন আপনি রিসার্চ করছেন?

—দ্রৌপদী। আই ওয়ান্ট টু শো হার অ্যাজ দ্য ভিকটিম অব আপারকাস্ট পলিটিক্স।

—কিন্তু দ্রৌপদী নিজেও তো আপারকাস্ট উওম্যান।

—ইয়েস আপারকাস্ট বাট ভিকটিম অলসো। ওসব আপনি বুঝবেন না। তার চেয়ে যা করতে এসেছেন সেটাই করুন।

—এই যে করি। কফিও এসে গেছে। খেতে খেতে কথা বলা যাবে।

—একটু সংক্ষেপে বলবেন।

—দেখুন নীলাঞ্জনা, অভিভাবকেরা আমাদের বিয়েতে সম্মতি দিয়েছেন। কিন্তু আপনার এই বিয়েতে আপত্তি আছে। হয়তো আপনার আপত্তি মেনে নিয়ে আমার সরে যাওয়াই উচিত। কিন্তু আমি সেটা পারছি না। আপনাকে আমার ভালো লাগে বলেই পারছি না। তাই জানতে চাইছি আপনার আপত্তিটা ঠিক কোথায়?

—সে তো বাবা আপনার বাবাকে বলেছেন।

—জানি। কিন্তু আমি আপনার মুখ থেকে শুনতে চাই।

—প্রথম আপত্তি আপনার নামে।

—কেন নুটুবিহারী নামটা কি খারাপ?

—খারাপ মানে। জঘন্য। ভদ্রসমাজে বলার মতো নয়।

—নামটা আমার ঠাকুমা রেখে ছিলেন। তিনি মারা গেছেন। আমার নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে ঠাকুমার স্মৃতি। এই অবস্থায় নাম বদলানো কি ঠিক হবে?

—সে আমি জানি না। আমার হাজব্যান্ডের নাম নুটুবিহারী হবে না, ব্যাস।

—বেশ, দ্বিতীয় আপত্তি?

—আপনাদের ব্যবসায়। কীসের যেন ব্যবসা আপনাদের? মনেও থাকে না ছাই!

—আমরা বাঁশ দিই।

—বাঁশ দেন মানে?

—আমাদের বাঁশের গোলা আছে। প্রোমোটার ডেকরেটরদের আমরা বাঁশ সাপ্লাই করি।

—ছিঃ, এটা কোনও ব্যবসা হলো!

—কেন হবে না! দারুণ প্রফিট।

—শুধু প্রফিট দেখলে তো চলবে না, স্টেটাসটাও দেখতে হবে। আমি একটা স্কুলে পড়াই। সামনের বছর নেটে বসব। কোয়ালিফাইও করব। তারপর কলেজ। আমার কলিগরা যখন জিজ্ঞাসা করবে, তোমার হাজব্যান্ড কী করেন, কী বলব তাদের?

—বলবেন বাঁশের গোলা আছে। পৈতৃক ব্যবসা।

—না, বলব না।

—ঠিক আছে। এবার আপনার তৃতীয় আপত্তিটা শুনি।

—আপত্তি কি একটা নাকি যে এক দুই তিন করে বলব। এটুকু জেনে রাখুন আমাদের পছন্দ অপছন্দ রুচি কোনওটাই মেলে না।

—আচ্ছা নীলাঞ্জনা, আপনি তো জীবনে প্রথম আজ আমায় মিট করলেন। আমার পছন্দ অপছন্দ আপনি জানলেন কী করে?

—আপনার মা তো আমাকে বলেছেন—

—যেমন?

—যেমন আপনি খুব জোরে গাড়ি চালাতে ভালোবাসেন সেটা আমার একেবারেই পছন্দ নয়। তারপর ধরুন, আপনি চেইনস্মোকার। এই কফিশপে স্মোকিং করা যায় না বলে খেতে পারছেন না, বাইরে বেরোলেই ধরাবেন। সেটাও আমার পছন্দ নয়।

—আমার আর আপনার মিল নিয়ে মা কিছু বলেনি?

—মিল। কীসের মিল?

—আপনি কবিতা পড়তে ভালোবাসেন, আমিও বাসি।

—জানি তো। আপনি বাঁশের গোলায় বসে কবিতা পড়েন। শুধু পড়েন না, লেখেনও। ওসব ঢপ অন্য কাউকে দেবেন, বুঝেছেন।

—আপনি কি জানেন সুবোধ ঘোষ একসময় বাস কন্ডাক্টারি করতেন? সমরেশ বসু কারখানার লেবার ছিলেন? আমরা সাহিত্যশিল্পকে এলিটিস্ট অ্যাঙ্গেল থেকে দেখতে ভালোবাসি। তাতে দেবত্ব আরোপ করতে সুবিধে হয়। আমরা ভুলে যাই খেতখামার কলকারখানা বা বাঁশের গোলার ঘামরক্তে ভরা যে জীবন, তারও কিছু বলার থাকতে পারে।

—একসেলেন্ট! আপনি তো দেখছি দারুণ কথা বলেন। কিন্তু কথাশিল্পের আড়ালে আপনি কিন্তু একটা ইমপর্ট্যান্ট প্রশ্ন এড়িয়ে যাচ্ছেন। আপনি কবিতা পড়তে ভালোবাসলে আন্টি মানে আপনার মা নিশ্চয়ই কথাটা আমাকে বলতেন।

—মা ভুলে গেছে।

—আমি বিশ্বাস করি না।

—বিশ্বাস করা না করা আপনার ব্যাপার।

—বেশ, তর্কের খাতিরে আপনার কথা মেনে নিলাম। কবিতা যখন পড়েন, এখনকার বাংলা কবিতা সম্বন্ধে আপনার নিশ্চয়ই স্পষ্ট ধারণা আছে?

—পরীক্ষা নেবেন না কি?

—স্কুলে পড়াই তো, পরীক্ষা নেওয়াটা আমাদের বার্থরাইট। কার কার কবিতা পড়েছেন?

—অনেকেরই। জয় গোস্বামী, শ্রীজাত, অরুণাংশু মিত্র।

—আর সুতীর্থ বসু?

—আমি জানি আপনি সুতীর্থ বসুর মস্ত বড়ো ফ্যান। মেসোমশাই আমাকে বলেছেন। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কী, সুতীর্থর কবিতা আমার একটু ব্যাকডেটেড বলে মনে হয়।

—সুতীর্থর কবিতা ব্যাকডেটেড। আমারই ভুল, আপনি যে কবিতা বোঝেন না সেটা বোঝার পরেও আলোচনা করা উচিত হয়নি।

—কী মুশকিল, টুয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরিতে ছন্দ নিয়ে ওই লেভেলের বাড়াবাড়ি করাটা ব্যাকডেটেড হওয়ার লক্ষণ নয়?

—না, নয়।

—ছন্দ জিনিসটাই তো অনাধুনিক।

—মোটেই নয়। সুতীর্থ ছন্দ ভাঙতে জানেন। নানারকমের এক্সপেরিমেন্ট করেন। তাই তার কবিতা হয়ে ওঠে

আধুনিক। কনটেন্ট আর ফর্মের এমন কম্বিনেশন অন্য কারোর কবিতায় দেখান তো?

—আপনি দেখছি পাগল আর অন্ধ দুটোই।

—হ্যাঁ আমি পাগল। সুতীর্থর নিন্দে করলে আমি তাকে খুন পর্যন্ত করতে পারে।

—সুতীর্থকে দেখেছেন কখনও?

—না।

—না দেখেই এমন গভীর ভাবে ভালোবেসে ফেললেন?

—এ আবার কী কথা। ভালোবাসব কেন? উনি আমার প্রিয় কবি।

—আপনি সত্যি কথা বলছেন না।

—এটা বুঝি আপনার নতুন চাল। গতিক সুবিধের নয় দেখে সুতীর্থর মাধ্যমে কনভিনস করার চেষ্টা করছেন।

—আরে না না। আমি তো জানি আপনি আমায় বিয়ে করবেন না। আমি আবার আপনাকে ছাড়া অন্য কাউকে বিয়ে করতে পারব না। তাই পুরোপুরি দেবদাস হওয়ার আগে আপনাকে একটা প্রস্তাব দিতে চাই।

—কী প্রস্তাব!

—আলাপ করবেন সুতীর্থর সঙ্গে?

—আমি প্র্যাকটিক্যাল জোক পছন্দ করি না।

—আমি সিরিয়াসলি বলছি নীলাঞ্জনা। করবেন আলাপ?

—তার জন্য আমায় নিশ্চয়ই বাঁশের গোলায় যেতে হবে। সেখানে সুতীর্থ আসবেন।

—বাঁশের গোলার ব্যাপারটা আপনি ভোলেননি দেখছি।

—ভুলব কেন। ওটাই তো আপনার পৈতৃক ব্যবসা।

—ভেবেছিলাম আপনি আমার ঠাট্টাটা ধরে ফেলবেন। পারলেন না যখন আমাকেই সব বলতে হবে।

—আর কিছু বলার দরকার নেই। এবার আমি উঠব।

—এখন উঠলে গল্পের ক্লাইম্যাক্সটা কিন্তু মিস করবেন।

—ক্লাইম্যাক্স! কীসের ক্লাইম্যাক্স?

—কলকাতা শহরের কোনও বাঁশের গোলার মালিককে অলটো চড়ে কফিশপে যেতে দেখেছেন কখনো? দেখেননি তো? আমার একটা এমবিএ ডিগ্রি আছে ম্যাডাম। পৈতৃক ব্যবসাও একটা আছে, তবে সেটা বাঁশ দেওয়ার নয়, ইমপোর্ট এক্সপোর্টের। মাসিমা মেসোমশাই দুজনেই এ কথা জানেন।

—বাবা মা জানেন অথচ আমায় বলেননি। অসম্ভব। হতেই পারে না।

—বেশ তো, ফোন করে জেনে নিন।

—কিন্তু, এত ইমপর্ট্যান্ট একটা ইনফরমেশন ওরা গোপন করবেন কেন?

—আমি বলেছিলাম বলে।

—আপনি বলেছিলেন। কেন?

—নিজের পরিচয়টা একটু অন্যভাবে দেব বলে।

—আপনার পরিচয়। আপনি তো নুটুবিহারী।

—আমি সুতীর্থ বসু। যার নিন্দে শুনলে আপনি খুন পর্যন্ত করতে পারেন।

—মানে!

—খুব সিম্পল। অপনার মাসতুতো দাদা রন্টু আমার বন্ধু। ওই একদিন আপনাকে দেখিয়েছিল। আমার এত ভালো লেগেছিল যে ওইখানেই স্পট ডিসিশন নিয়েছিলাম বিয়ে করলে আপনাকেই করব। রন্টুর কাছে শুনেছিলাম আপনি নাকি আমার সঙ্গে প্যাশনেটলি প্রেম করেন। কিন্তু আমায় কখনও দেখেননি। সেটা খুব একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। আমি তো পাবলিক প্রোগ্রাম বিশেষ করি না। তাই মাসিমা মেসোমশাই আর রন্টুর সঙ্গে কথা বলেই এই প্ল্যানটা করেছিলাম। নিজেকে একটু ড্রামাটিক্যালি প্রেজেন্ট করব। আপনি খুব রেগে যাবেন আর আমি প্রতিটা মোমেন্ট এনজয় করব।

—আপনি সুতীর্থ বসু।

—ইয়েস ম্যাডাম।

—প্লিজ আমার সঙ্গে ঠাট্টা করবেন না। সুতীর্থ আমার কতখানি আপনি জানেন না। আমি সাহিত্যের ছাত্রী। জীবনে অনেক কবিতা পড়েছি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ আর সুতীর্থ বসু ছাড়া কেউ আমার মন খারাপের সঙ্গী হতে পারেননি। সুতীর্থর নাম করে কেউ কিছু বললে আমি পৃথিবীর যে-কোনও মিথ্যে বিশ্বাস করে ফেলতে পারি।

—আমি একবর্ণও মিথ্যে বলছি না নীলাঞ্জনা।

—আপনি সত্যিই আমায় বিয়ে করতে চান?

—চাই।

—কিন্তু আমি তো খুব সাধারণ সুতীর্থ। যদি আপনাকে সুখী করতে না পারি?

—সুখী করার দায়িত্ব একা নেবেন না। যদি আমায় সুখী করতে না পারেন তা হলে ধরে নিতে হবে আমিও আপনাকে সুখী করতে পারিনি।

—এরকমই থাকবেন তো সারা জীবন?

—থাকব।

—খুব ভালো লাগছে জানেন। মনে হচ্ছে নুটুবিহারী নামটা খুব একটা খারাপ ছিল না।

—প্রফেশন হিসেবে বাঁশ দেওয়াও খুব একটা খারাপ নয়।

—বাঁশই তো দিলেন।

—মানে!

—ভেবেছিলাম একবার ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে যাব। কিন্তু এরপর পড়াশোনার কি আর মন বসবে?

—ছি ছি কাজটা তা হলে বেশ অন্যায় হলো। তবে এসব ক্ষেত্রে শাস্ত্রে প্রায়শ্চিত্তের বিধান আছে।

—আপনি শাস্ত্রও পড়েছেন না কি? তা, শুনি কী বিধান।

—আর এক রাউন্ড কফি বলা যেতে পারে।

—শুধু কফি নয় সঙ্গে স্ন্যাক্স জাতীয় কিছু।

—যখন তখন যা তা খাবেন?

—কী করব! আপনার হাতে যখন পড়েই গেলাম তখন মাঝে মাঝে নুটুবিহারী তো হতেই হবে। ■

স্বাধীনতা সংগ্রামী

কমলা মুখোপাধ্যায়

স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রেক্ষাপটে একটি ঘটনা বিশেষভাবে মনে পড়ছে। সময়টা গত শতাব্দীর ষাটের দশকের প্রথম দিক। আমি তখন স্কুলে উঁচু ক্লাসে পড়ি। তখনকার রীতি অনুযায়ী আমার বাবা গৃহশিক্ষকের জন্য খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন। অনেকেই এসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে অবশেষে একজন নিযুক্ত হয়েছিলেন। নাম কমলা মুখোপাধ্যায়— একটি বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা। কাঁচাপাকা চুল, নাতিদীর্ঘ উচ্চতা, গৌরবর্ণা। তাঁর পড়ানো দক্ষতায় সহজেই বশীভূত হয়ে গেলাম।

পড়ানোর সময় তিনি মূল তথ্যের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক নানা তথ্য গল্পের আকারে উপস্থাপিত করতেন। তিনি আসতেন সন্ধ্যেবেলায়। উৎসুক হয়ে অপেক্ষা করতাম কখন তিনি আসবেন। জেনেছিলাম তিনি শিয়ালদহের প্রাচী সিনেমার কাছে থাকতেন।

এমনি করে কেটে গেল কয়েকটা বছর। ভালোভাবে স্কুল ফাইনাল পাশ করলাম। তারপর হঠাৎ যেন তিনি জীবন থেকে হারিয়ে গেলেন। মাঝে মাঝে তাঁর কথা মনে পড়ত। আবার ঘটনা প্রবাহের অভিঘাতে তা চাপা পড়ে যেত।

এর বহুদিন পরে ১৯৯৭ সালে স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর। টিভিতে সকাল থেকে চলছে দেশাত্মবোধক প্রোগ্রাম। হঠাৎ দেখলাম ফুটে উঠল কয়েকজন অপ্রধান নারী স্বাধীনতা সংগ্রামী। শান্তি, সুনীতি, বীণা দাস প্রমুখ সর্বজন পরিচিতারা নন। যাঁরা অগোচরে থেকে গেছেন তাঁরাই ছিলেন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু। নেপথ্যে থাকা এই নারীদেরই তুলে এনেছেন দূরদর্শন কর্তৃপক্ষ। হঠাৎ দেখলাম তাঁদের মধ্যে বসে আছেন কমলাদি। চেহারা প্রায় একই রকম আছে।শুধু সময়ের স্বাক্ষর রেখে বলিরেখা পড়েছে। লেগেছে বয়সের

ছাপ। সঞ্চালিকার প্রশ্নের উত্তরে সেই অগ্নিযুগের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে তাঁর কৃচ্ছতা ও কারাবরণের স্মৃতি তুলে ধরলেন। আমার বিস্ময়ের তখন কূলকিনারা ছিল না। ছবির তলায় তখন নাম ফুটে উঠেছে— কমলা মুখোপাধ্যায়। বিপ্লবী জীবনের পরিচয় কোনও দিনই তিনি দেননি। কিছুকাল পরে আমার হাতে এসেছিল বীরাঙ্গনাদের নিয়ে লিখিত একটি বই। তাতে আবিষ্কার করেছিলাম কমলাদির তরুণী বয়সের ছবি। চিনতে এতটুকু অসুবিধা হয়নি। বাসস্থানের উল্লেখে সেখানেও দেখলাম আমার পরিচিত শিয়ালদহ অঞ্চলের প্রাচী সিনেমার সন্নিকট। দেখলাম ১৯১৩ সালই তাঁর জন্মসাল। পড়েছিলাম ঘাত-প্রতিঘাতপূর্ণ চাঞ্চল্যকর রাজনৈতিক জীবনের ইতিবৃত্ত। ইচ্ছে তাকলেও তাঁর সঙ্গে আর যোগাযোগ হয়নি। কমলাদি আজ পরপারে। আমার কাছে তিনি নারী স্বাধীনতা-সংগ্রামী অপেক্ষা স্নেহশীলা, সুদক্ষা শিক্ষিকা হিসেবেই অবিস্মরণীয়া।

রূপশ্রী দত্ত

ভারতের পথে পথে

তিরুপতি

ভারতের হিন্দু তীর্থগুলির মধ্যে অন্ধ্রপ্রদেশের দক্ষিণ প্রান্তে তিরুপতি অন্যতম। বিশ্বের সবচেয়ে বিত্তশালী মন্দির এই তিরুপতি। মন্দিরের অর্থে নানান জনহিতৈষী কাজকর্ম চলে। লোকমুখে তিরুপতি হলেও তিরুমালা-তিরুপতি দেবস্থানম নামে খ্যাত। সারা বছর ধরে তীর্থযাত্রী আসেন দেশদেশান্তর থেকে। তেলুগু ভাষায় তিরু শব্দের অর্থ শ্রী বা লক্ষ্মী অর্থাৎ লক্ষ্মীর পতি বিষ্ণু তথা বালাজী। ১০০ কেজি সোনায় মোড়া গর্ভগৃহে পদ্মের ওপর ২ মিটার উঁচু কষ্টিপাথরের দণ্ডায়মান বালাজীর বিগ্রহ। মন্দিরে বছরে ভক্তদের প্রণামী পড়ে পাঁচ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি। প্রতিদিন ২০ হাজার ভক্ত মন্দির দর্শন করে পূজা দেন। বিশেষ বিশেষ দিনে ভক্ত সমাগম ১ লক্ষেরও বেশি হয়। তিরুমালা পাহাড়ে ৩১টি মন্দির ও ৭টি কুণ্ড রয়েছে।

জানো কি?

- সিন্ধুনদের উৎপত্তি তিব্বতের মানস সরোবরের নিকটবর্তী সিন-কা-বাব হিমবাহ থেকে। আরব সাগরে পতিত হয়েছে।
- ব্রহ্মপুত্রের উৎপত্তি তিব্বতের মানস সরোবরের কাছে চেমায়ুং দুং হিমবাহ থেকে। বঙ্গোপসাগরে পড়েছে।।
- লুনি নদীর উৎপত্তি আরাবল্লী পর্বতের আনাই সাগর হ্রদ থেকে। কচ্ছের রানে পড়েছে।।
- নর্মদা নদী মহাকাল পর্বতের অমরকণ্টক শৃঙ্গ থেকে উৎপত্তি হয়েছে। ভারুচের কাছে কাম্বে উপসাগরে পড়েছে।।

ভালো কথা

জাতীয় পতাকার অপমান নয়

স্বাধীনতা দিবসের দিন প্রতি বছর আমরা আমাদের পাড়া কাগজের জাতীয় পতাকা দিয়ে সাজাই। তারপর দেশাত্মবোধক গান গাইতে গাইতে সারা পাড়া পরিক্রমা করি। এবার স্বাধীনতা দিবসের একদিন আগে রাজেনকাকু বলেছেন, আগামীকাল পাড়ায় স্কুলে ও ক্লাবে জাতীয় পতাকা উঠবে। কাগজের ছোটো ছোটো পতাকায় পাড়া সাজানো যাবে না। একদিন পরেই সেই পতাকা খুলে রাস্তায় গড়াগড়ি খায়। তাতে জাতীয় পতাকার অপমান হয়। ১৫ আগস্ট পতাকা উত্তোলনের পর সুজয়ের ঠাকুমা রাজেন কাকুকে বলল , ভাগ্যিস তোর মাথায় এটা এসেছিল।

শুভম সেন, নামোপাড়া, ঝালদা, পুরুলিয়া।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

ছোটদের কলমে

বৃষ্টির দিনে

শ্রেয়া সিংহ, চতুর্থ শ্রেণী, গঙ্গাজল ঘাটি, বাঁকুড়া।

বৃষ্টির দিনে আমি আর দিদি
লুকিয়ে লুকিয়ে ভিজতে থাকি।
ভিজতে ভিজতে গান গাই
তখন কী যে আনন্দ পাই।

মা তখন দেখতে পেলে
হা রে রে করে তেড়ে আসে
দিদি আমি ভয়ে কাঁপি
বাবা তখন হি হি হাসে।

এই বিভাগে ছোটরা কবিতা লিখে পাঠাও

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
দূরভাষ : 8420240584
হোয়াটস্ অ্যাপ - **7059591955**
E-mail : swastika5915@gmail.com
ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।
(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

স্বস্তিকা

পূজা সংখ্যা : ১৪২৫

মহালয়ার আগেই প্রকাশিত হবে

পরিবারের সবাই মিলে পড়ার মতো পত্রিকা

দেবী প্রসঙ্গ

স্বামী যুক্তানন্দ

উপন্যাস

শেখর সেনগুপ্ত - অবেক্ষণ।। সুমিত্রা ঘোষ— কুসুম কুমারী
জিষ্ণু বসু—হাতি ঘোড়া পাল কী

উপন্যাসোপম কাহিনি

প্রবাল চক্রবর্তী - মাতৃরূপেণ সংস্থিতা

গল্প

এষা দে, রমানাথ রায়, শেখর বসু, সিদ্ধার্থ সিংহ, সন্দীপ চক্রবর্তী
গোপাল চক্রবর্তী, তাপস অধিকারী

ভ্রমণ

কুণাল চট্টোপাধ্যায়— রেনেসাঁর ভূমিতে

প্রবন্ধ

অচিন্ত্য বিশ্বাস, প্রণব চট্টোপাধ্যায়, সারদা সরকার, সুদীপ বসু,
অভিজিৎ দাশগুপ্ত, সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, অর্ণব নাগ

আপনার কপি আজই বুক করুন।। দাম : ৭০.০০ টাকা

কংগ্রেস নেতারা ক্ষুদ্র স্বার্থে ভারতের অস্মিতাকে অস্বীকার করছেন

ড. মনমোহন বৈদ্য

চার্চের সমর্থনে ও অ-ভারতীয় কমিউনিস্ট ভাবধারায় প্রভাবিত কংগ্রেস দলের কিছু নেতা ক্ষুদ্র স্বার্থে ঘৃণ্য বয়ান দিয়ে ভারতের পরিচয় ও গৌরবকে যে আঘাত করেছেন তা শুধু আশ্চর্যজনক নয়, পীড়াদায়কও বটে। এই সকল উচ্চ শিক্ষিত মানুষ যখন এই ধরনের বক্তব্য পেশ করেন তখন ১৯৪৯ সালে এডুকেশন কমিশনের রিপোর্টে ভারতের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ড. রাধাকৃষ্ণনের মন্তব্যটি মনে পড়ে। ড. রাধাকৃষ্ণন অ-ভারতীয় চরিত্রের বিষয়ে লিখেছিলেন, '' ভারতবর্ষে বিদ্যমান শতাব্দী প্রাচীন শিক্ষা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অন্যতম একটি গুরুতর অভিযোগ হলো যে, এটি ভারতের অতীতকে অবহেলা করেছে এবং এটি ভারতের ছাত্রকুলকে তাদের নিজ সংস্কৃতি সম্পর্কে অবহিত করেনি। কিছু ক্ষেত্রে এটি এমন একটি অনুভূতি সৃষ্টি করেছে যেন আমরা শিকড়হীন, কিছু ক্ষেত্রে তাদের বুঝিয়েছে যে, আমরা শিকড়ের মাধ্যমে যে জগতের সঙ্গে যুক্ত সেটি আমাদের পারিপার্শ্বিকের থেকে ভিন্ন, যেটি আরও খারাপ।''

অতি সম্প্রতি এক প্রবীণ কংগ্রেস নেতা এ রকমই ক্ষতিকর বয়ান দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, বিজেপি যদি পুনরায় ক্ষমতায় আসে তবে ভারত 'হিন্দু পাকিস্তান' হয়ে যাবে। অ-ভারতীয় কমিউনিস্ট মতাদর্শ ও প্রভাবের কারণে অ-ভারতীয়করণ এতটাই গভীরে চলে গেছে যে, তা আমাদের চিন্তাভাবনা ও শব্দ চয়নকেও প্রভাবিত করেছে। 'হিন্দু পাকিস্তান', 'হিন্দু তালিবান', 'হিন্দু সন্ত্রাস'— এই সব পরিভাষা সম্পূর্ণরূপে অ-ভারতীয় চিন্তনকেই প্রদর্শিত করে। সত্যি বলতে কী, 'হিন্দু পাকিস্তান' এই অভিব্যক্তিটি স্ববিরোধী। এই বয়ানটির অর্থহীনতা বোঝার পূর্বে আমাদের বুঝতে হবে ভারত এবং হিন্দুত্ব কী।

অতি সম্প্রতি নাগপুরে ভারতবর্ষ সম্পর্কে বলতে গিয়ে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় বলেন, '' ইউরোপীয় 'জাতি-ভিত্তিক রাজ্য'(নেশন স্টেট)-এর ধারণা থেকে ভারত রাষ্ট্রের ধারণা একেবারে আলাদা। পাশ্চাত্য ধারণায় যে রাষ্ট্র বিকশিত হয় তার ভিত্তি হলো একটি নির্দিষ্ট অঞ্চল, একটিই ভাষা, একটিই উপাসনা পদ্ধতি, একই শত্রু। এভাবেই তাদের নেশন স্টেট গড়ে ওঠে। অন্য দিকে ভারতীয় রাষ্ট্রবোধ উদগত হয় বিশ্ববোধ থেকে। যেটি তার শিকড়ের সন্ধান পায় বসুধৈব কুটুম্বকম্, সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ, সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ-র বিশ্বব্যাপী চিন্তনে। সমগ্র বিশ্বকে আমরা একটি পরিবার মনে করি এবং সবার সুখ ও নিরাময়ের কামনা করি। আমাদের জাতীয় পরিচয় উদ্ভূত হয়েছে মিলন, আত্তীকরণ ও সহাবস্থানের দীর্ঘ সময় সাপেক্ষ পদ্ধতির মাধ্যমে। সংস্কৃতি, বিশ্বাস ও ভাষার বহুত্বই ভারতবর্ষকে বিশেষ স্থান দেয়। আমরা আমাদের শক্তি কেবল সহিষ্ণুতা থেকে আহরণই করি না, স্বীকৃতি ও শ্রদ্ধাও করে থাকি। আমরা স্বীকৃতি ও শ্রদ্ধা করি বহুত্ববাদকে। বিবিধতাকে নিয়ে গর্ব করি। শতাব্দী জুড়ে এটিই আমাদের সামগ্রিক চেতনার অঙ্গ থেকেছে। এটিই আমাদের রাষ্ট্রীয় পরিচিতি।''

> 'ভারত তেরে টুকরে হোঙ্গে' 'ভারত কী বরবাদী তক জঙ্গ চলেগি জঙ্গ চলেগি' ধ্বনি অশিক্ষিত, গরিব, পিছিয়ে পড়া মানুষদের মাধ্যমে নয়, এগুলি নির্গত হয় সবচেয়ে প্রগতিশীল মনে করা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের, ভারতীয় প্রজ্ঞার আধুনিকতম যুবা প্রতিষ্ঠানের মুখ থেকে। এই ছাত্র-ছাত্রীরা সমর্থন পায় সেই বিদ্বান ও শিক্ষাবিদদের কাছ থেকে যাঁরা এদেশের সম্পদ থেকেই নিজেদের রুজি আহরণ করেন। শিক্ষার মাধ্যমে অ-ভারতীয়করণের এর থেকে বড় জ্বলন্ত উদাহরণ আর কীই বা আছে!

মূলত এই উদার, সর্ব-সমাবেশক, সহিষ্ণু ও বৈশ্বিক চিন্তনের ভিত্তিটি হলো ভারতের অধ্যাত্ম ভিত্তিক একাত্ম ও সর্বাঙ্গীণ দৃষ্টিভঙ্গি। সমগ্র পৃথিবী সেটা জানে। ড. রাধাকৃষ্ণন এই জীবন দর্শনকে হিন্দু জীবন দর্শন বলে অভিহিত করেছেন। এর স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্যের মূল্যায়ন করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, '' হিন্দু পদ্ধতিতে সংস্কার প্রত্যেক গোষ্ঠীকে তাদের অতীতের সম্পর্কগুলি বজায় রাখতে শেখায় এবং নিজের পরিচয় তথা হিতের সংরক্ষণও করে। ছাত্র-ছাত্রীরা যেমন নিজেদের বিশ্ববিদ্যালয়কে নিয়ে গর্ববোধ করে, তেমনি এই গোষ্ঠী নিজেদের দেবতাদের নিয়ে গর্ববোধ করে। আমাদের ছাত্রদের এক মহাবিদ্যালয় থেকে অন্য মহাবিদ্যালয়ে নিয়ে যেতে হবে না, বরং প্রত্যেক মহাবিদ্যালয়ের স্তর উঁচু করতে হবে, তাদের মনোন্নয়ন করতে হবে, তাদের আদর্শকে পরিশীলিত করতে হবে যাতে করে প্রত্যেক মহাবিদ্যালয় থেকে আমরা একই লক্ষ্য প্রাপ্ত করতে পারি।'' তিনি আরও বলেন, '' আমরা দেখি হিন্দুরা একই পরম তত্ত্ব মেনে চলেন, যদিও তাকে ভিন্ন ভিন্ন নাম দিয়ে থাকেন। তাঁর সামাজিক ব্যবস্থায় বহু জাতপাত বিদ্যমান, কিন্তু সমাজ একটিই। সমাজে বহু সম্প্রদায় রয়েছে কিন্তু সকলে একই তত্ত্ব দ্বারা আবদ্ধ হয়ে আছেন।''

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর স্বদেশ ও সমাজ প্রবন্ধে লিখেছেন, '' বহুর মধ্যে ঐক্য উপলব্ধি, বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য স্থাপন--- ইহাই ভারতবর্ষের অন্তর্নিহিত ধর্ম। ভারতবর্ষ পার্থক্যকে বিরোধ বলিয়া জানে না, সে পরকে শত্রু বলিয়া কল্পনা করে না। এই জন্যই ত্যাগ না করিয়া, বিনাশ না করিয়া, একটি বৃহৎ ব্যবস্থার মধ্যে সকলকেই সে স্থান দিতে চায়। এই জন্য সকল পন্থাকেই সে স্বীকার করে— স্বস্থানে সকলেরই মাহাত্ম্য সে দেখিতে পায়। ভারতবর্ষের এই গুণ থাকাতে, কোনও সমাজকে আমাদের বিরোধী বলিয়া কল্পনা করিয়া ভীত হইব না। প্রত্যেক নব নব সংঘাতে অবশেষ আমরা আমাদের বিস্তারেরই প্রত্যাশা করিব। হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, খ্রিস্টান ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে পরস্পর লড়াই করিয়া মরিবে না— এইখানে তাহারা একটা সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পাইবে। সেই সামঞ্জস্য অহিন্দু হইবে না, তাহা বিশেষভাবে হিন্দু। তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যতই দেশ-বিদেশের হউক, তাহার প্রাণ, তাহার আত্মা ভারতবর্ষের।''

কংগ্রেস নেতারা ভুলে যান যে, এই উদার, সর্বগ্রাহ্য, অখণ্ড ও সর্বাঙ্গীণ আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যকে অস্বীকার করে পাকিস্তান গঠিত হয়েছিল। এটি শিক্ষার মাধ্যমে অ-ভারতীয়করণ ও কমিউনিস্ট ভাবধারার ফসল। যতদিন ভারত হিন্দুত্বের মধ্যে নিহিত থাকবে ততদিন কখনই পাকিস্তান হবে না। শুধুমাত্র হিন্দুত্বকে প্রত্যাখ্যানের ফলেই পাকিস্তানের জন্ম হয়। হিন্দুত্ব নামে পরিচিত ভারতের অধ্যাত্ম-কেন্দ্রিক সাংস্কৃতিক ও মতাদর্শগত ঐতিহ্য হলো ভারতের অস্মিতা। ভারতের একতা, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের মধ্যেই রয়েছে তার অস্তিত্ব। আধুনিক ও উচ্চশিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও বা সেই কারণেই কংগ্রেসের নেতারা নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থ চরিতার্থ করতে এই অস্মিতাকেই অস্বীকার করেছেন। তাঁরা কি জানেন না যে, অস্মিতাকে অস্বীকার করার ফলে ভারতের অস্তিত্ব সংকট হতে পারে? এই অস্মিতাকে অস্বীকার করার ফলেই ভারতের বিভাজন হয়েছিল। বাস্তব হলো, এই উদার, সহিষ্ণু ও পাঁচহাজার বছরের পুরনো বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতির কথা প্রণব মুখোপাধ্যায় বলেছেন। ড. রাধাকৃষ্ণন ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যাকে হিন্দু দর্শন বলে অভিহিত করেছেন সেটি পাকিস্তানও উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে। পাকিস্তান হয়ে যাওয়ার কারণ হলো সেই সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের বন্ধনকে সে ছিন্ন করেছে। সে যদি পুনরায় সেই ঐতিহ্যের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে তবে সে তার ইসলাম উপাসনা ত্যাগ না করেও হিন্দু হয়ে থাকতে পারে। এম সি চাগলা, ড. এ.পি.জে কালাম এবং পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত তারিক ফতেহ্‌র মতো অগণিত মানুষ ইসলামে বিশ্বাস রেখেও নিজেদের সেই ঐতিহ্যের সঙ্গে জুড়তে পেরেছেন। এই ভাবে মুসলমান দেশ হয়েও পাকিস্তান যদি সেই উদার ও সহিষ্ণু ঐতিহ্যকে গ্রহণ করে তবে সে 'হিন্দু পাকিস্তান' হয়ে যাবে। অন্যভাবে বলতে গেলে 'ভারত' হয়ে যাবে। রাজনৈতিক পরিচয়কে অক্ষুণ্ণ রেখেই তারা এটি করতে পারে। একটি পৃথক সার্বভৌম দেশ হওয়া সত্ত্বেও আমাদের আর এক প্রতিবেশী দেশ নেপাল সেই সাংস্কৃতিক-আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পেরেছে। এই কারণেই আমরা দুই দেশের মধ্যে মুক্ত সীমান্তের এক অনন্য ব্যবস্থা দেখতে পাই।

সেই গভীর সাংস্কৃতিক মূলের কারণেই ভারতের পরিচিতি নির্মাণ হয়েছে। সেই মূলের সঙ্গে যুক্ত থাকা অর্থাৎ নিজেদের অস্মিতার সঙ্গে সন্নিবিষ্ট থাকা ভারতের অস্তিত্বের জন্যই প্রয়োজনীয়। এই পরিচয়কেই ড. রাধাকৃষ্ণন ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হিন্দুত্ব বা জীবন দর্শন বলেছেন। যদি কারো হিন্দু শব্দ নিয়ে আপত্তি থাকে তবে তিনি একে ভারতীয় বা ইন্ডিকও বলতে পারেন। এতে তার অন্তর্নিহিত বিষয়বস্তুটি একই থাকে, তা হলো আমাদের প্রাচীন অধ্যাত্ম-কেন্দ্রিক অখণ্ড ও সর্বাঙ্গীণ জীবন দর্শন। সত্য একই, কিন্তু তাকে ভিন্ন ভিন্ন নামে ডাকা যায়। ভারতীয় চিন্তনের এটিই হলো সারমর্ম। এই বিষয়বস্তুটি হলো গুরুত্বপূর্ণ।

ভারতের সংস্কৃতি-অধ্যাত্ম ঐতিহ্যে গভীরভাবে নিহিত ব্যক্তির চিন্তন কী রকম হবে? আচার্য মহাপ্রাজ্ঞের একটি বাণী থেকেই এর উদাহরণ পাওয়া যাবে। আচার্য মহাপ্রাজ্ঞ তেরাপন্থ শ্বেতাম্বর জৈন পরম্পরার প্রধান। জাতীয় স্তরের সন্ত হবার কারণে তাঁর চতুর্দিকে স্বীকৃতি ও প্রতিষ্ঠা ছিল। তিনি বলতেন, ''আমি তেরাপন্থী, কারণ আমি স্থানকবাসী জৈন। আমি স্থানকবাসী জৈন, কারণ আমি শ্বেতাম্বর জৈন। আমি শ্বেতাম্বর, কারণ আমি জৈন এবং আমি জৈন, কারণ আমি হিন্দু।'' ভারতীয় মত-পথের এটি একটি সুন্দর অভিব্যক্তি। কোনও একজন ব্যক্তি একই সঙ্গে তেরাপন্থী, স্থানকবাসী জৈন, শ্বেতাম্বর জৈন এবং হিন্দু হতে পারেন। এর কারণ হলো ভারতীয় চিন্তন এই বৈচিত্র্যময় স্তরগুলির মধ্যে কোনও স্ববিরোধিতা দেখে না। এগুলি একেরই ভিন্ন ভিন্ন বহিঃপ্রকাশ। এটিই ভারতীয় ঐতিহ্য। কিন্তু এর ব্যাখ্যা তখনই পালটাতে থাকে যখন এই গভীর মূলের সঙ্গে যোগসূত্রটি ক্ষয়িষ্ণু হয়ে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে ব্যাখ্যাটিও বদলে যায়।

গভীর শিকড়টির সঙ্গে যোগসূত্রের অবক্ষয় খুব বেশি হলে ব্যাখ্যাটি একেবরেই বদলে যায়। আমি জৈন, শ্বেতাম্বর, স্থানকবাসী বা তেরাপন্থী যাই হই না কেন, আমি হিন্দু নই। এবং তখনই এর মধ্যে রাজনীতি প্রবেশ করে। শিকড়ের সঙ্গে যোগসূত্রের খুব বেশি অবক্ষয়ের ফলে হিন্দু পাকিস্তান, হিন্দু তালিবান, হিন্দু সন্ত্রাস— এই ধারণাগুলি মনের মধ্যে উৎপন্ন হতে থাকে। এই অবক্ষয়টি পূর্ণ হতেই অ-ভারতীয়করণের প্রক্রিয়াটি পূর্ণ হয়ে 'ভারত তেরে টুকরে হোঙ্গে' ' ভারত কী বরবাদী তক জঙ্গ চলেগি জঙ্গ চলেগি' ধ্বনি উঠতে থাকে। তাও আবার অশিক্ষিত, গরিব, পিছিয়ে পড়া মানুষদের মাধ্যমে নয়, এগুলি নির্গত হয় সবচেয়ে প্রগতিশীল মনে করা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের, ভারতীয় প্রজ্ঞার আধুনিকতম যুবা প্রতিষ্ঠানের মুখ থেকে। এই ছাত্র-ছাত্রীরা সমর্থন পায় সেই বিদ্বান ও শিক্ষাবিদদের কাছ থেকে যাঁরা এদেশের সম্পদ থেকেই নিজেদের রুজি আহরণ করেন। শিক্ষার মাধ্যমে অ-ভারতীয়করণের এর থেকে বড় জ্বলন্ত উদাহরণ আর কীই বা আছে!

ফলে পাঁচহাজার বছর ধরে নির্মিত ভারতবর্ষের ঐক্যবদ্ধ যাত্রা এবং সামগ্রিকতার যে ভারতীয় পরিচয়ের উল্লেখ প্রণববাবু করেছেন তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়ে। আমরা যদি এই গভীর শিকড়টির সঙ্গে নিজেদের যোগসূত্রটি রক্ষা করতে পারি, তবেই আমরা জগতে নিজেদের পরিচয়টি সুরক্ষিত রাখতে পারব। প্রখ্যাত কবি প্রসূন যোশী তাঁর কবিতায় লিখেছেন— ''ছিন্নমূল হে বৃক্ষ শুকিয়ে যাবে তুমি।/ যত গভীরে যাবে তোমার শিকড়টি, তত হরিৎ হবে তুমি।''

(লেখক রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সহ সরকার্যবাহ)

মার্কস্‌বাদ অথবা বুর্জোয়া গবেষণাগারে বানানো সর্বহারার টনিক

দেবাশিস লাহা

দ্বিতীয় পর্ব

বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের প্রবক্তার নাম তো জেনে গেছেন— কার্ল মার্কস। আচ্ছা বলুন তো বৈজ্ঞানিক থুড়ি অবৈজ্ঞানিক ধনতন্ত্রের প্রবক্তার নাম কী? জানেন না তো? আচ্ছা তবে বলুন বৈজ্ঞানিক থুড়ি অবৈজ্ঞানিক সামন্ততন্ত্রের প্রবক্তার নাম কি? এটিও জানেন না? উঁহু একদম লজ্জা পাবেন না। কারণ এই ব্যবস্থাগুলির কোনো প্রবক্তা নেই। সমাজতন্ত্রের প্রবক্তা আছে, কিন্তু ধনতন্ত্র, সামন্ততন্ত্র ইত্যাদির প্রবক্তা নেই কেন? উত্তরটি খুব সোজা। কারণ ধনতন্ত্র পর্যন্ত যে আর্থ-সামাজিক বিবর্তন তা স্বাভাবিক বিবর্তন তথা বিকাশের মাধ্যমে ঘটেছে। তাঁর জন্য কোনো প্রবক্তা অথবা রক্তক্ষয়ী বিপ্লবের দরকার পড়েনি। সময়ের আবর্তনে ধাপে ধাপে এই আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনগুলি হয়েছে। এ বিষয়ে Lewis H. Morgan এর Ancient Society (1877) একটি অবিস্মরণীয় গ্রন্থ।

মার্কস সাহেব এবং তাঁর বন্ধু এঙ্গেলস এই বইটির উপর ভিত্তি করেই তাঁদের বিজ্ঞানসম্মত সমাজতন্ত্রের ভবিষ্যদ্‌বাণী নির্মাণ করেন। এঙ্গেলস বলেন, পরিশেষে মানে সমাজতন্ত্রের সর্বশেষ ধাপে State wither away অর্থাৎ রাষ্ট্র শুকনো পাতার মতো ঝরে যাবে। টমাস মোর ইউটোপিয়া নামক একটি গ্রন্থে এই অবাস্তব স্বপ্নটিকেই তুলে ধরেন। Lewis H. Morgan এর Ancient Society নামক বইটির উপর ভিত্তি করেই মার্কস ও এঙ্গেলস দুই বন্ধু The Origin of the Family, Private Property, and the State, in the Light of the Researches of Lewis H. Morgan

পরিবার, ব্যক্তিমালিকানার জন্ম থেকে শুরু করে রাষ্ট্রের উৎপত্তি —একটি সামগ্রিক ছবি আঁকার প্রয়াস অবশ্যই করেছেন। এই মার্কসীয় সমাজতন্ত্র বুঝে নেওয়ার আগে, মর্গ্যান বর্ণিত আর্থ সামাজিক (যা এখন সব সমাজতাত্ত্বিকই মেনে নিয়েছেন) বিবর্তনটি দেখে নেওয়া যাক। সেটি কী? মানব আবির্ভাবের আদি লগ্নটি অর্থাৎ প্রাচীন প্রস্তর যুগ যাকে বলা হয় (অথবা তারও আগে) সেই সময় কোনো সামাজিক বৈষম্য ছিল না। ধনী, দরিদ্র, বুর্জোয়া, সর্বহারা ইত্যাদি— শ্রেণী বলতে যা বুঝি তাঁর কোনো অস্তিত্ব ছিল না। তখন একটি আদিম সাম্যবাদী ব্যবস্থা (primitive communism) বিরাজিত ছিল। কোনো একটি নৃগোষ্ঠী (tribe) যে সব পশু-পাখি শিকার করত অথবা যা ফলমূল সংগ্রহ করত, সবাই সমান ভাগে ভাগ করে নিত। আনুমানিক ৬০ হাজার বছর আগে এই অবস্থাটিই চালু ছিল।

এই সময়ের মধ্য ভাগেই মানুষ আগুন আবিষ্কার করে। এর পরে আসে পশু পালন এবং অস্থায়ী/ খণ্ডিত কৃষির যুগ। এই সময়ই ক্রমে ক্রমে শ্রেণী বৈষম্যের সূত্রপাত ঘটে। শক্তিশালী গোষ্ঠী অন্য গোষ্ঠীর পশু, কৃষিদ্রব্য গায়ের জোরে দখল করত এবং পরাজিতদের দাস বানিয়ে রাখত। রক্তক্ষয়ী লড়াই চলত। ৩৫ হাজার বছর আগের এই সময়কালটিকে বর্বরতার যুগ বা দাস যুগ বলা হয়। এভাবেই চলল দীর্ঘকাল। তারপর শুরু হলো সুসংহত, পরিকল্পনা মাফিক কৃষিকার্য। দৃঢ় হলো পরিবার তথা ব্যক্তি মালিকানার ভিত্তি। যারা বেশি জমি নিজের ভাগে আনতে পারলেন। (যেভাবেই হোক, ফাঁকা মাঠের উপর কব্জা জমিয়ে বা দখল করে) তাঁরা হয়ে উঠলেন শক্তিশালী শাসক তথা শোষক গোষ্ঠী। বিভিন্ন নাম হলো তাঁদের। এদেশে জমিদার, জোতদার। ব্রিটেন ফ্রান্সে কাউন্ট, ব্যারন। রাশিয়ায় কুলাক। হ্যাঁ এভাবে মোটামুটি পাঁচ হাজার বছর আগে জন্ম হলো সামন্ততন্ত্রের চারণভূমি। সুতীব্র হলো সামাজিক তথা আর্থিক বৈষম্য। সুনির্দিষ্ট দুটি শ্রেণী গড়ে উঠল— একদিকে রাজা, জমিদার এবং তাঁদের মদতদাতা পুরোহিত সম্প্রদায় অপরদিকে ছোট/প্রান্তিক/ ভূমিহীন কৃষক। আর্থ-সামাজিক চরিত্র যেহেতু উৎপাদন যন্ত্রের মালিকানার (means of production) উপর নির্ভর করে তাই জমির মালিকানা ভোগ করা জমিদার হলো শাসক/শোষক শ্রেণী। জনমজুর, ভূমিহীন কৃষক হলো শোষিত শ্রেণী যাদের সংখ্যা অনেক বেশি।

সামাজিক বিবর্তন চলতে থাকল। নতুন নতুন প্রযুক্তি, বিজ্ঞানের আবিষ্কার হলো। সূচনা হলো শিল্প বিপ্লবের। জন্ম হলো কারখানার। সামন্ততন্ত্র ক্রমে ক্রমে ভেঙে পড়ল। তার গর্ভ থেকে জন্ম নিল ধনতন্ত্র যা বর্তমানে আমরা দেখতে পাচ্ছি। উৎপাদন যন্ত্রের ভিত্তি আর কৃষিতে আটকে থাকল না, তার জায়গা নিল শিল্প। জন্ম হলো নতুন দুটি শ্রেণীর। কলকারখানা তথা সমস্ত উৎপাদন যন্ত্রের মালিক বুর্জোয়া শ্রেণী (বুর্জোয়া শব্দটির আদি অর্থ যদিও নগরের অধিবাসী। সেটিই ক্রমে চরম

নেতিবাচক অর্থে ব্যবহৃত হতে থাকল) আর বুর্জোয়াদের অধীনে যারা কলকারখানায় কাজ করতে শুরু করল তাঁরাই সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণী। এঁরাই শোষিত, অত্যাচারিত। এই পর্যন্ত ঠিক ছিল। স্বাভাবিক বিবর্তনের মাধ্যমে যা যা ঘটেছে মর্গ্যান সাহেব তা পর্যবেক্ষণ এবং নথিভুক্ত করেছেন। কিন্তু এখানেই কি শেষ? সমাজ কি আর এগোবে না? এখান থেকেই মার্কস সাহেব দায়িত্ব নিলেন। তিনি বললেন, এতদিন পৃথিবীতে কতিপয় মানুষ বেশি সংখ্যক মানুষের উপর অত্যাচার শোষণ করেছে।

আগে রাজা/জমিদার, এখন মালিক তথা বুর্জোয়া শ্রেণী--- মার খেয়েছে ভূমিহীন কৃষক, আর শ্রমিক। এর পর আর এটি চলবে না। এর পর শ্রমিক/সর্বহারা শ্রেণী/প্রলেতারিয়েত (যাদের শৃঙ্খল ছাড়া কিছুই হারানোর নেই) এই বুর্জোয়া ব্যবস্থা ভেঙে ফেলবে, মালিক শ্রেণীকে পরাজিত করবে এবং সর্বহারার একনায়কতন্ত্র (Dicatorship of the proletariet) প্রতিষ্ঠিত হবে। জন্ম নেবে একটি শোষণহীন আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা যেখানে কোনো শ্রেণী বৈষম্য থাকবে না। উৎপাদন যন্ত্রের মালিকানা থাকবে রাষ্ট্রে হাতে। আর এই রাষ্ট্রই সবাইকে তার প্রয়োজন অনুযায়ী সব কিছু দেবে। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, জীবিকা ইত্যাদি। প্রতিটি নাগরিকও তার সাধ্যমত শ্রম দেবে। "From each according to his ability, to each according to his needs"–(Critique of the Gotha Program.) এই মার্কসীয় স্লোগানটি সুবিখ্যাত হয়ে উঠল। বেশ ভালো কথা। সেটি কীভাবে সম্ভব হবে? স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায়? যেভাবে এতদিন হয়ে এসেছে— আদিম সাম্যবাদ থেকে আধুনিক ধনতন্ত্র। তিনি বললেন হ্যাঁ স্বাভাবিক ভাবেই হওয়ার কথা। কিন্তু তার জন্য তো বসে থাকা যায় না। অতএব সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে বুর্জোয়াদের ক্ষমতাচ্যুত করে সর্বহারার অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। কেমন একটা রোমাঞ্চ ব্যাপার না? অনন্যসাধারণ এক অ্যাডভেঞ্চার! বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের কাছে। অস্ত্র হাতে বীর ত্রাতা হওয়ার সুবর্ণ সুযোগ। পাশাপাশি অস্ত্র বর্ষণেরও সুযোগ— সে পুরুলিয়াতে হোক অথবা ল্যাতিন আমেরিকায়। এবার আশা করি বুঝেছেন কেন এই মতাদর্শটিকে আমি স্বাভাবিক না বলে কৃত্রিম বলছি আর কেনই বা এর একটি প্রবক্তার প্রয়োজন হলো। কারণ স্বাভাবিক নিয়মে পৃথিবীর কোনো দেশেই এই তথাকথিত সমাজতন্ত্র আসবে না। একটিও উদাহরণ দিই। সোভিয়েত থেকে চীন, কিউবা থেকে ভিয়েতনাম যেখানেই এই 'বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র' সমাজতন্ত্র এসেছে, সবই বলপ্রয়োগের দ্বারা সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে কার্বাইড দিয়ে আম পাকানোর মতো। ফল আমাদের চোখের সামনে। মার্কসবাদ আসলে ব্রিটেনের বুর্জোয়া ল্যাবরেটরিতে তৈরি একটি সর্বহারার টনিক যা উজ্জ্বল একটি আগামীর স্বপ্ন দেখায়। এমন এক অমৃত যার ফর্মূলা মার্কসবাদে বলে দেওয়া হয়েছে। জল আগে থেকেই ছিল। আমরা গবেষণায় জেনেছি হাইড্রোজেনে এবং অক্সিজেন ২ : ১ অনুপাতে মেশালে গবেষণাগারেও একে বানিয়ে ফেলা যায়। কিন্তু অমৃত কোথাও নেই। কিন্তু একজন জ্ঞানীগুণী ব্যক্তি বলে গেছেন কিলিয়ে কাঁঠাল পাকালে অমৃত পাওয়া যাবে। অতএব লেগে পড়।

সর্বহারা লেগে পড়ল। সবাই নয়, কেউ কেউ। তবে যারা নেতৃত্ব দিলেন সবাই বুর্জোয়া। লেনিন ধনী মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান, কাস্ত্রো কিউবার সুগারকেন ব্যারনের পুত্র। তাঁর বাবা কত বড় বুর্জোয়া ছিলেন, ধনসম্পত্তি কেমন ছিল সে আলোচনাতে না হয় গেলাম না। সুকৌশলে ছড়িয়ে দেওয়া এই সমাজবদলের স্বপ্নটিকে সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমেই হোক অথবা স্তালিনীয় কায়দায় অন্য দেশের উপর চাপিয়ে দেওয়াই হোক, বেশ কিছু দেশেই তো পরিণতি লাভ করেছিল। সেসব বানের জলে ভেসে গেল কেন? ১৯১৭-তে নভেম্বর বিপ্লবের মাধ্যমে সমাজতন্ত্রের পীঠস্থান হয়ে ওঠা সোভিয়েত ইউনিয়নের এমন দশাই বা হলো কেন? সেটি এখন আপাতমস্তক ধনতন্ত্র। কিন্তু মার্কস সাহেব তো এমন বলেননি! ধনতন্ত্র তো পেছন দিকে হেঁটে আবার সামন্ততন্ত্র হয়ে উঠছে না, তবে সমাজতন্ত্র কেন পেছনে হাঁটছে? তবে কি বুর্জোয়া গণতন্ত্র তথা ধনতন্ত্র বেশি আকাঙ্ক্ষিত?

উত্তর নিহিত আছে অন্ধ বস্তুবাদের ভিত্তিতে শ্রেণী চরিত্র নির্ধারণের ভ্রান্তির মধ্যে। ধনতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থায় উৎপাদনের সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে মূলত দুটি শ্রেণীর কথা বলা হয়েছে— বুর্জোয়া এবং প্রলেতারিয়েত। বুর্জোয়াদেরও শ্রেণী বিভাগ করা হয়েছে যেমন—পেটি বুর্জোয়া, স্বাধীন বুর্জোয়া, কম্প্রাডোর বুর্জোয়া ইত্যাদি। বিপ্লবী চেতনাহীন সর্বহারাকে বলা হয়েছে লুম পেন প্রলেতারিয়েত। কিন্তু মারাত্মক গলদটি হলো এই যে শ্রেণীবিভাগ করার সময় কেবল বাহ্যিক উৎপাদন সম্পর্কটিকেই আধার ধরা হয়েছে, মনস্তাত্ত্বিক দিকটিকে একেবারেই গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। দ্বান্দ্বিকতা অথবা ডায়ালেকটিক্স যে নামেই ডাকুন, তা কিন্তু মার্কস সাহেবের অবিষ্কার নয়। ফয়েকবাক এবং হেগেল তাঁর আগেই ডায়ালেটিক্সের কথা বলেছেন। আর হেগেলই তাকে প্রথম একটি সুসংহত রূপ দিয়েছেন। তবে তাঁর ডায়ালেটিক্স ভাববাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। সেখানে ম্যাটার নয় আইডিয়াকেই অনেক বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। হেগেলের মতে এই আইডিয়াই বিশ্ব ইতিহাস তথা সামাজিক বিকাশ/বিবর্তন নিয়ন্ত্রণ করে। এটিই চালিকাশক্তি। অর্থাৎ আইডিয়াই ম্যাটারকে নিয়ন্ত্রণ করে। মার্কস সাহেব এই বোধটিকেই উল্টে দিলেন--- বললেন হেগেল ভুল ডায়ালেকটিক্স-এর জন্ম দিয়েছেন। এর মাথা নীচের দিকে, পা উপর দিকে। আগে আইডিয়া নয়, ম্যাটার। ম্যাটার অর্থাৎ বস্তুই আইডিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে। তাই একে সোজা করে দিতে হবে। বিশ্ব ইতিহাস তথা আর্থ সামাজিক বিষয়গুলিকে বস্তুবাদের নিরিখে বিশ্লেষণ করতে হবে। শুরু হলো যান্ত্রিক ব্যাখ্যা এবং অপব্যাখ্যা।

(চলবে)

বাংলা সিনেমার সেরা জুটি উত্তম-সুচিত্রা

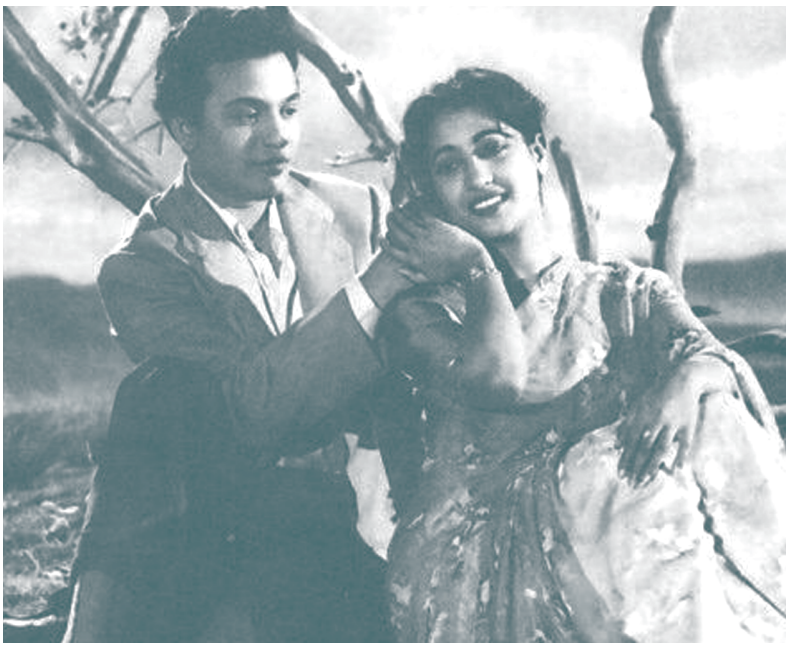

দিলীপ পাল

কাননদেবী যখন নায়িকার ভূমিকা থেকে সরে এসে দিদি-মাসি- পিসি-মার চরিত্রে অভিনয় করতে শুরু করেন তখন বাংলা চলচ্চিত্রে নায়িকার জায়গাটায় একটা শূন্যতা সৃষ্টি হয়। অন্য নায়িকারা যে ছিলেন না তা নয়। তাঁরাও যথেষ্ট ভালোই অভিনয় করছিলেন। তবুও দর্শককুল অন্য কিছু চাইছিল। ঠিক তখনই বাংলা রুপোলি পর্দা আলো করে এলেন সুচিত্রা সেন। যার আসল নাম রমা।

পাটনার করুণাময় দাশগুপ্ত ও ইন্দিরা দেবীর মেজো মেয়ে রমার জন্ম পাবনার (অধুনা বাংলাদেশে) মামার বাড়িতে ৬ এপ্রিল ১৯৩১ সালে। পাবনায় তাঁর বড় হওয়া ও পড়াশুনো। ওখান থেকেই প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করেন। অল্প বয়সেই বিবাহ হয় কলকাতার বালিগঞ্জ প্লেসের দিবানাথ সেনের সঙ্গে, ১৯৪৭ সালে। স্বামীর আগ্রহেই রুপোলি জগতে আসা। অবশ্যই শ্বশুর আদিনাথ সেনের সম্মতি নিয়ে। সিনেমা জগতে এসে নতুন নামকরণ হয় 'সুচিত্রা'। পরিচালক সুকুমার দাশগুপ্তের সহকারী নীতীশ রায় দেন নামটা। প্রথম ছবি 'শেষ কোথায়?' সে ছবিটি মুক্তিলাভ করেনি। মুক্তিপ্রাপ্ত প্রথম ছবি 'সাত নম্বর কয়েদি'। নায়ক সমর রায়। ১৯৫৩ সালে ছবিটি মুক্তিলাভ করে। এবছরই মুক্তিলাভ করে 'সাড়ে চুয়াত্তর' ও 'কাজরী'। 'সাড়ে চুয়াত্তর' ছবির নায়ক ছিলেন উত্তমকুমার। এই ছবিটি বাঙালির মন জয় করে। শুরু হয় উত্তম-সুচিত্রার জয়যাত্রা। আলোকের ঝরণা ধারায় ভেসে যায় বাংলা রুপোলি জগৎ। সুচিত্রা সেনের অসামান্য রূপ-লাবণ্য, রাজকীয় চালচলন, অনন্য সাধারণ ব্যক্তিত্ব, অসাধারণ অভিনয় প্রতিভা, ডায়লগ বলার আশ্চর্য সুন্দর কায়দা, গানের লিপ দেবার সুষমামণ্ডিত ক্ষমতা, ভুবনজয়ী হাসি, চোখের চাউনি ইত্যাদি সবকিছুই দর্শকমুগ্ধ করা ছিল। তাই বাঙালি দর্শক সোনার সিংহাসন পেতে ছিল তাঁদের হৃদয়ে এই অসামান্য অভিনেত্রীর জন্য। দর্শক এতদিন যার প্রতীক্ষায় ছিল তাকেই যেন পেয়ে গেল। এরপরের ছবি 'ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য'। সুচিত্রা সেন বিষ্ণুপ্রিয়া, বসন্ত চৌধুরী নিমাই। দেবকী বসু ছবিটি পরিচালনা করেন। এ ছবিতে তার অভিনয় দর্শকের হৃদয় মন ভরিয়ে দেয়। ১৯৫৪ সালে তাঁর আটটি ছবি মুক্তিলাভ করে। সেই মুক্তিপ্রাপ্ত ছবিগুলি হলো--- 'ঢুলি', 'অগ্নিপরীক্ষা', 'ওরা থাকে ওধারে', 'অন্নপূর্ণার মন্দির', 'অ্যাটমবম', 'সদানন্দের মেলা', 'গৃহপ্রবেশ', 'বলয়গ্রাস'। প্রতিটি ছবি হিট হয়। তাঁর মধ্যে সুপার হিট হয় 'অগ্নিপরীক্ষা', 'ঢুলি', 'অন্নপূর্ণার মন্দির' এবং ওরা থাকে ওধারে। এরপর থেকে তাঁকে আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি। উত্তম-সুচিত্রা জুটির ছবিগুলি দারুণ হিট করে। উত্তম-সুচিত্রা মানেই উপচে পড়া ভিড়। টিকিটের জন্য বিশাল লাইন। একই ছবি ছ'বার, আটবার দেখা। এই জুটির ছবি দেখার জন্য বাঙালি দর্শকের ছিল অফুরান উৎসাহ।

সুচিত্রা সেন বাংলায় ৫৩টি ও হিন্দিতে ৭টি ছবি করেছেন। তাঁর মধ্যে ৩০টি বাংলা ছবিতে নায়ক ছিলেন উত্তমকুমার। সেই সব ছবিতে তিনি প্রমাণ করে গেছেন বাংলা চলচ্চিত্রে এরাই সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ জুটি।

জীবনে অনেক পুরস্কার পেয়েছেন। তবে দর্শকদের ভালোবাসাই তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। ১৯৬৩ সালে পান মস্কো চলচ্চিত্র উৎসবে শ্রেষ্ঠ নায়িকার পুরস্কার। ১৯৬৬ ও ১৯৭৩ সালে 'মমতা' ও 'আঁধি'র জন্য ফিল্মফেয়ার পত্রিকা তাঁকে সম্মানিত করে। ২০০৫ সালে পান ভারতীয় চলচ্চিত্রের শ্রেষ্ঠ সম্মান 'দাদাসাহেব ফালকে' পুরস্কার। যদিও পুরস্কার তিনি ফিরিয়ে দেন। ২০১২ সালে পান বঙ্গবিভূষণ সম্মান।

১৯৭৮ সালে তাঁর অভিনীত ছবি 'প্রণয়পাশা' বক্স অফিসে নিদারুণভাবে ফ্লপ করে। এ ছবির নায়ক ছিলেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। এর ঠিক আগে উত্তমকুমার ও প্রদীপকুমারের সঙ্গে করা 'গৃহদাহ'ও দর্শকের মন জয় করতে পারেনি। মহানায়িকা মনে মনে ভীষণ দমে যান। তাঁর মনে হয় ঢের হয়েছে আর নয়। মাসি-পিসি বা মা'র চরিত্র করায় তাঁর কোনোদিনও আগ্রহ ছিল না। যৌবনবতী নায়িকাই থাকতে চেয়েছেন দর্শকের চোখে। এরপর তিনি লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে যান। তাঁকে আর দেখা যায়নি। শেষ বিদায়বেলায় কেউ তাঁকে দেখতে পায়নি। তিনি কফিনের ভেতরে শেষ শয্যায় শায়িত ছিলেন। হলিউডের উজ্জ্বল তারকা গ্রেটা গার্বোও ৪১টি সফল ছবি করার পর অন্তরালে চলে যান। শেষকৃত্যেও কেউ তাঁকে দেখতে পায়নি।

সৌন্দর্য, সুষমা, ব্যক্তিত্ব ও অভিনয় দিয়ে সুচিত্রা সেন যে দীপ জ্বেলে ছিলেন দর্শক হৃদয়ে তা চিরভাস্বর হয়ে থাকবে। ■

এতদিনে উদ্বাস্তু আন্দোলনের দাবি পূর্ণ হলো

ড. জিষ্ণু বসু

যে মানুষগুলো চোখের সামনে স্বজনকে খুন হতে দেখে এদেশে এসেছেন, তাদের আর রাজনৈতিক দালালদের পা ধরে বা অসাধু প্রশাসনিক আধিকারিকদের ঘুষ দিয়ে এদেশে থাকতে হবে না।

অসমের জাতীয় নাগরিক পঞ্জিকরণের নির্দেশ ছিল মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের। সেই নির্দেশ মেনেই ভারতের রেজিস্টার জেনারেল মোট ৩ কোটি ২৯ লক্ষ অসমবাসীর আবেদনপত্র পরীক্ষা করেছিলেন। গত ৩০ জুলাই এই ন্যাশনাল রেজিস্টার অব সিটিজেনসের (এন আর সি) খসড়া প্রকাশিত হয়েছে। এই খসড়াতে ৪০ লক্ষ ৭ হাজার ৭০৭ জন মানুষের নাম নেই। প্রাথমিক খোঁজ খবরের ভিত্তিতে তারা অসমের অবৈধ বসবাসকারী। অবশ্য যাদের নাম নেই তারা ৩০ আগস্ট থেকে ২৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আবার আবেদন করতে পারবেন। আবার হবে সংযোজন ও পরিমার্জন। তার পরেই হবে চূড়ান্ত তালিকা।

অসমে এনিয়ে যত না উত্তেজনা তৈরি হয়েছে, তার থেকে বহু গুণ অশান্তি এখানে তৈরি করা হচ্ছে। এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, প্রথমে বললেন এটা 'বাঙালি খেদাও' কর্মসূচি, তারপর বললেন এতে 'গৃহযুদ্ধ' লাগবে, 'রক্তগঙ্গা' বইবে। দেশের সর্বোচ্চ আদালতের কোনো নির্দেশের বিষয়ে এমন প্ররোচনামূলক কথা বলা যায় কি? তাঁর দলের নেতা-নেত্রীরা আগুনে ঘৃতাহুতি দিতে অসমের শিলচরেও গিয়েছিলেন। অসমের মানুষ এ রাজ্যের সম্মাননীয় মন্ত্রী ফিরাদ হাকিমদের পত্রপাঠ বিদায় দিয়েছেন। দলের নেতাদের এমন অপ্রত্যুৎপন্নমতি আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের অসমের রাজ্য সভাপতি দীপেন কুমার পাঠক সাংবাদিক সম্মেলন করে পদত্যাগ করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের প্রচারমাধ্যমেও বেশ একটা 'গেল গেল' রব উঠেছে। অসম থেকে বাংলাভাষী শিরোনাম দিয়ে ঘণ্টায় ঘণ্টায় 'ঘণ্টাখানেকের' অনুষ্ঠান হচ্ছে। আলোচনা মানে বিভিন্ন মারপ্যাঁচে বিজেপি বধের সুপরিকল্পিত কার্যক্রম। এফএমের প্রভাতী অনুষ্ঠান থেকে কাগজের উত্তর সম্পাদকীয় সর্বত্রই 'বাংলা আর বাঙালিকে' বাঁচানোর এক করুণ আর্তি। বাংলাকেও রণসাজে সাজতে হবে! সুতরাং 'মারি অরি পারি যে কৌশলে!'

ধ্বনিবর্ধক যন্ত্র যার হাতে থাকে তার সুবিধা হলো তাকে বিশেষ একটা যুক্তি বা তথ্য মানতে হয় না। শুধু গল্পটা সুন্দর করে বলতে পারলেই হলো। একই গল্প বারবার বলে যাও, কে আর তথ্যের উৎস জানতে চাইবে, কেই বা যুক্তি নিয়ে তর্ক করতে কাগজের অফিসে ছুটবে। এমনই একটা বিষয় হলো অসমে নাম বাদ যাওয়া ৪০ লক্ষ বাঙালি। প্রকৃতপক্ষে এই তালিকা বেশিরভাগই 'বাংলাদেশি মুসলমান', তাদের কেবলমাত্র বাঙালি বলা সত্যের অপলাপ।

'বাংলাদেশি মুসলমান' এই কথাটি বিশেষ ভাবে বলার কারণটা কী? মানে তারা কেবলমাত্র বাঙালি নন, পশ্চিমবঙ্গ থেকে যাওয়া ভারতীয় মুসলমান নন, তারা স্বাধীন বাংলাদেশ থেকে আসা মুসলমান। হলেই বা? মানুষ তো পেটের টানে ভারতে আসছেন। গরিব মানুষের মধ্যে এই সাম্প্রদায়িক বিভেদ তো নিষ্ঠুরতা। না! একেবারেই বিষয়টা ভিন্ন। আইনের দিক থেকেও ভিন্ন, আর মানবতার দিকে থেকে তো দুটো মিলিয়ে ফেলা একভাবে সামাজিক অপরাধ।

প্রথমে আইনের বিষয়টা দেখা থাক। বাংলাদেশ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র, ভারতবর্ষও তাই। বাংলাদেশের একজন নাগরিক ভারতবর্ষে এসে বসবাস শুরু করলে আন্তর্জাতিক আইনে তার সম্পূর্ণ ভিন্ন দুটি পরিচয় হতে পারে। হয় তিনি উদ্বাস্তু (রিফিউজি) নতুবা তিনি অনুপ্রবেশকারী (ইল্‌লিগ্যাল ইমিগ্রান্ট)। এখন প্রশ্ন, উদ্বাস্তু কে? ইউনাইটেড নেশনস্ হাইকমিশন ফর

রিফিউজিস (ইউ এন এইচ সি আর) তাদের ১৯৫৯ সালে জেনেভা বৈঠকে উদ্বাস্তু বা রিফিউজির সংজ্ঞা তৈরি করে। পরবর্তীকালে ১৯৬৭ সালের উরুগুয়ে প্রোটোকলে দু-একটা শব্দবন্ধ জুড়ে আজকের সংজ্ঞা তৈরি হয়েছে। সেই সংজ্ঞা হিসাবে, যদি কেউ ধর্ম, জাতি, বর্ণ, রাজনৈতিক মতামত, সামাজিক গোষ্ঠী ইত্যাদি কারণে অত্যাচারিত এক দেশে ফিরে গিয়ে গভীর ভয় আছে মনে করে ফিরে যেতে না চান, তবে সেই ব্যক্তি উদ্বাস্তু বা রিফিউজি। বাস্তব ঘটনা হলো দেশভাগের সময় থেকে কেবল হিন্দুরাই পূর্ববঙ্গে অত্যাচারিত হয়েছেন। আর অত্যাচার সহ্য করতে না পেরেই দেশ ছেড়েছেন। ১৯৫১ সালেও পূর্ববঙ্গে হিন্দুর জনসংখ্যা কমবেশি শতকরা ২৪ ভাগ ছিল, আজ সেই সংখ্যা কেবল ৮ শতাংশ। এর একমাত্র কারণ লাগাতার অত্যাচার। অসহনীয় অত্যাচার। তাই ইউ এন এইচ সি আর-এর সংজ্ঞায় বাংলাদেশ থেকে আসা হিন্দু বা বৌদ্ধই কেবল এদেশে উদ্বাস্তু বা রিফিউজি। কিন্তু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ থেকে কোনো মুসলমান অর্থনৈতিক বা অন্য কারণে যদি ভারতে আসেন তাহলে তিনি অবশ্যই 'অনুপ্রবেশকারী'। আন্তর্জাতিক বিধি অনুসারেই দুজনের বিষয়ে দু'রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

এবার আসি মানবিকতার প্রসঙ্গে। বাংলাদেশ বা পূর্বপাকিস্তান থেকে সর্বস্বান্ত হয়ে ভারতে আসা এই হিন্দু উদ্বাস্তুদের সঙ্গে কংগ্রেস বা বামপন্থী দলগুলি সর্বদা নির্মম আচরণ করে এসেছে। কংগ্রেস সরকার হিন্দু উদ্বাস্তুদের কখনো মধ্য ভারতে দণ্ডকারণ্যে কখনো বা ওড়িশার মালকান গিরিতের পশুখামারে রাখার ব্যবস্থা করেছিল। খোলা ট্রাকে জন্তুজানোয়ারের মতো পুরুষ, মহিলা, শিশু সবাইকে একসঙ্গে উড়িয়ে এক প্রদেশ থেকে অন্য প্রদেশের ক্যাম্পে পাঠিয়েছে। রোগে, বিনা চিকিৎসায়, অনাহারে 'মানা' ক্যাম্পের মতো কত উদ্বাস্তু শিবিরে শত শত মানুষ মারা গেছেন। প্রতিদিন মৃতদেহের স্তূপ করে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হতো ক্যাম্পগুলোতে। বামদলগুলি শুরু থেকেই উদ্বাস্তু ভোটব্যাঙ্ক তৈরিতে ব্যস্ত ছিল। কিন্তু ক্ষমতায় আসার সঙ্গে সঙ্গে নখ দাঁত বের করল। বামফ্রন্ট মরিচঝাঁপির মতো পৈশাচিক ঘটনা ঘটাল। ১৯৭৯ সালে সুন্দরবনের মরিচঝাঁপিতে পূর্ববঙ্গ থেকে আসা তপশিলি জাতিভুক্ত হিন্দু উদ্বাস্তুদের উপর নির্বিচারে গুলি চালায় জ্যোতি বসুর পুলিশ। শত শত মানুষ মারা গেল। এর আগে সেখানে মেয়েদের পানীয় জল আনতে যাওয়ার নৌকাগুলোকে লঞ্চ দিয়ে ধাক্কা মেরে ডুবিয়ে দিয়েছিল বামফ্রন্টের পুলিশ। সব হারানো উদ্বাস্তু মানুষগুলোকে খাবার বন্ধ করে তিল তিল করে মেরেছিল নতুন ক্ষমতায় আসা সিপিএম।

দশকের পর দশক ধরে একটার পর একটা খাগড়াগড় ঘটে চলবে? ভারতবর্ষের মতো একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের অধিকার থাকবে না নিজের দেশের নাগরিকদেরপঞ্জি তৈরি করার? সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে ঢুকে যাবে শত শত স্লিপার সেল?

স্বাধীন ভারতবর্ষে নরেন্দ্র মোদীর বর্তমান সরকারই বোধহয় পাকিস্তান বা বাংলাদেশ থেকে আসা হিন্দু উদ্বাস্তুদের জন্য পরিষ্কার কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। সিটিজেনশিপ (অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল, ২০১৬ অনুসারে বাংলাদেশ থেকে আসা কোনো হিন্দু যদি ২০১৪ সালের ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে ভারতে আসেন, তাহলে তিনি যতদিন খুশি বিনা উপদ্রবে ভারতে থাকতে পারবেন। ১৯৫৫ সালের নাগরিকত্ব আইনের সংশোধনের জন্য বিভিন্ন উদ্বাস্তু সংগঠন লাগাতার আন্দোলন করেছে। বর্তমান সরকারের এই বিল অবশ্যই সেই দাবির লক্ষ্যে কয়েক ধাপ এগিয়ে যাওয়া।

পশ্চিমবঙ্গে ভোটসর্বস্ব দলগুলি সব কিছু জেনে বুঝেই 'উদ্বাস্তু' আর 'অনুপ্রবেশকারীদের' একই বন্ধনীতে রেখেছে। কারণ দুজনেই তাদের ভোটার। বাংলাদেশের হিন্দু নির্যাতনে প্রতিবাদ না করেছে সিপিএম, না কংগ্রেস, না তৃণমূল। তাই বিনা প্রতিবাদে বাংলাদেশের একটার পর একটা গ্রাম, শহরগুলোতে পাড়ার পর পাড়া হিন্দুশূন্য হয়েছে। ধর্ষিতা মেয়ের মুখ চেপে ধরে মা বারাসাত বা ক্যানিং শহরে পালিয়ে এসেছেন। তারপর পার্টির বাবুদের পায়ে ধরে একটা রেশনকার্ড পেয়েছেন। কিন্তু তার অধিকারের বৈধ নাগরিকত্ব পাননি। পার্টির যোজনাতেই তারা এদেশে অবৈধ বসবাসকারী, অসৎ পুলিশের দু'পয়সা রোজগারের সহজ শিকার। পক্ষান্তরে সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে হিন্দুর আনুপাতিক হার প্রত্যেক দশকে লাফিয়ে লাফিয়ে কমেছে। এর মূল কারণ অবাধ বাংলাদেশি মুসলমান অনুপ্রবেশ। আজ পূর্ববঙ্গের থেকে আসা হিন্দুর বৈধ নাগরিকত্বের কথা বললে সবচেয়ে আগে, আন্তর্জাতিক আইনে উদ্বাস্তু আর অনুপ্রবেশকারীকে পৃথক করতে হবে। এন আর সি নিশ্চিতভাবে তার একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল হয়ে উঠবে।

ভারতবর্ষের সুরক্ষার জন্য এই অনুপ্রবেশকারীরা এক ভয়ানক সমস্যা।

সমস্যাটা পশ্চিমবঙ্গে আর অসমে প্রায় একই রকম। স্বাধীনতার পরে চোখের সামনে অসমের হাইলাকান্দি, বদরপুর, করিমগঞ্জের মতো জেলাগুলিতে হিন্দুরা সংখ্যালঘু হয়ে গেল। এই জেলাগুলিকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে আন্তর্জাতিক মৌলবাদীদের আস্তানা।

অনুপ্রবেশের সমস্যা যে কত ভয়াবহ তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছে বর্ধমানের খাগড়াগড় কাণ্ড। নদীয়া জেলার করিমপুরে এল বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী শাকিল আহমেদ। তদানীন্তন বামফ্রন্টের নেতাদের ধরে কিছুদিনের মধ্যেই ভোটার কার্ড তৈরি করে ফেলেছিল শাকিল। ভোটার কার্ড পেয়েই সে জেহাদি জঙ্গি সংগঠনে যোগ দেয়। সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে সিমুলিয়ার মতো খারিজি মাদ্রাসা তৈরি হয়। সেখানে কৌসরের মতো গরিব ঘরের ভারতীয় মুসলমান মেয়েরা যেতে থাকে। সেখান থেকে শাকিলের মতো অনুপ্রবেশকারীরা কৌসরের মতো ভারতীয় মুসলমান মেয়েদের বিয়ে করে জেহাদের জালে ফাঁসায়। এরপর রাজ্যে রাজনৈতিক ক্ষমতা পরিবর্তন হলো। তখন শাকিল বর্ধমানে এসে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা নুরুল হাসান চৌধুরীকে ধরল। পকেটে টাকাও আছে। তাই সহজেই বর্ধমান পৌর এলাকার পাশেই তৃণমূল কংগ্রেসের ভাড়া (?) করা অফিসের উপরের তলাতেই ঘর পেয়ে গেল শাকিল আহমেদ। সেখানে সে ইম্প্রোভাইসড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস (আই ই ডি) তৈরির কারখানা বানাল। ২০১৪ সালের ২ অক্টোবর খাগড়াগড়ের সেই ভয়ানক বিস্ফোরণে মারা যায় শাকিল এবং আর এক অনুপ্রবেশকারী। দেখা গেল এ রাজ্যের মাটিতে চিটফান্ডের টাকায় বাংলাদেশের নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠনের জন্য কীভাবে অত্যাধুনিক ভয়ঙ্কর বিস্ফোরক বানানো হচ্ছিল খাগড়াগড়ে। এখন প্রশ্ন হলো শাকিল আর আব্দুল হাকিমের স্ত্রীরা তো ভারতীয় মুসলমান মেয়ে। আজ যে তারা কোলে দুটো বাচ্চা নিয়ে নরকের জীবন কাটাচ্ছে এর জন্য দায়ী কে? তাই বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ ভারতবর্ষের হিন্দু এবং মুসলমান, সবার জন্যই সমান বিপজ্জনক।

প্রশ্ন হলো, আর কতদিন? দশকের পর দশক ধরে একটার পর একটা খাগড়াগড় ঘটে চলবে? ভারতবর্ষের মতো একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের অধিকার থাকবে না নিজের দেশের নাগরিকদের পঞ্জি তৈরি করার? সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে ঢুকে যাবে শত শত স্লিপার সেল?

অন্যদিকে একটা মৌলিক প্রশ্ন বাংলার সংবাদ মাধ্যমের সব ঘণ্টাখানেক অনুষ্ঠানের পরিবেশকের মাথায় কখনো আসে না। কেন বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর লাগাতার অত্যাচার হবে। ওদেশে হিন্দুদের ওপর পাশবিক অত্যাচার বন্ধ হলেই তো পশ্চিমবঙ্গ বা অসমে উদ্বাস্তু আসার স্রোত বন্ধ হবে। একটু মনে করে দেখুন তো, বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতনের প্রতিবাদে বিগত ২৫ বছরের মধ্যে বামফ্রন্ট কংগ্রেস বা তৃণমূল কংগ্রেস কলকাতায় কোনো প্রকাশ্য কর্মসূচি পালন করেছে কিনা? কোনো এগিয়ে থাকা খবরের কাগজ বা কোনো প্রগতিবাদী চ্যানেল বাংলাদেশে হিন্দুদের নিদারুণ কষ্টের কথা কোনো লেখায় প্রকাশ করেছে, বা কোনো অনুষ্ঠানে উপস্থাপন করেছে বলে আপনার স্মরণে আছে?

অথচ এই ২০০১ সালেই তো সারা বাংলাদেশ জুড়ে হিন্দু হত্যা, গণধর্ষণ আর অবাধ লুঠ হয়ে গেল। সে বছর ১৯ অক্টোবর বাংলাদেশের সিরাজগঞ্জে ১৩ বছরের পূর্ণিমা শীলকে সারা রাত ধরে তেরো-চোদ্দ জন মিলে ধর্ষণ করেছিল। পূর্ণিমার অসহায় মা জানতেন হিন্দু মেয়েকে বাঁচাতে কেউ আসবে না, উনি ওই ধর্ষকদের সারা রাত ধরে মিনতি করেছিলেন— 'বাবা তোমরা এক এক করে এস, একসঙ্গে না, আমার ছোট্ট মেয়েটা মরে যাবে।' সেদিন এপার বাংলার যত বীর বাঙালি, কলকাতার যত প্রগতিশীল বিদ্বজ্জন, উদার মানবতাবাদী সুশীল সমাজ মুখে কুলুপ এঁটে বসেছিলেন। একটা মোমবাতি মিছিলও বের করেননি।

এইসব প্রশ্ন পশ্চিমবঙ্গের ভোটলোভী রাজনীতিক আর মেরুদণ্ডহীন বুদ্ধিজীবীরা বরাবর কার্পেটের তলায় চাপা দিয়ে রেখেছিলেন। অসমের এন আর সি রিপোর্ট সেইসব প্রশ্নকে দিনের আলোতে এনেছে। সহজ সরল তিনটে উত্তর :

প্রথমত, বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতন চিরতরে বন্ধ করো। এপার বাংলা-ওপার বাংলার সব শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষকেই একযোগে এর সক্রিয় প্রতিবাদ করতে হবে। একজন হিন্দুও যদি আক্রান্ত হন তবে এপার থেকে খাবারের একটা দানাও ওপারে যাবে না।

দ্বিতীয়ত, নাগরিকত্ব (সংশোধনী) বিল, ২০১৬-কে সংসদের দুই কক্ষে পাশ করিয়ে নাগরিকত্ব আইনকে সুনিশ্চিত করতে হবে। যেসব দল, সংসদ এর বিরোধিতা করবেন তারা পূর্ববঙ্গের হিন্দু উদ্বাস্তুদের বিরোধী। পশ্চিমবঙ্গে প্রকাশ্যে তাদের জবাব দিতে হবে! ২০১৪ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে ভারতে আসা সব হিন্দু শরণার্থীকে ভারতবর্ষের বৈধ নাগরিকত্ব দিতে হবে। যে মানুষগুলো চোখের সামনে স্বজনকে খুন হতে দেখে এদেশে এসেছেন, তাদের আর রাজনৈতিক দালালদের পা ধরে বা অসাধু প্রশাসনিক আধিকারিকদের ঘুষ দিয়ে এদেশে থাকতে হবে না। পশ্চিমবঙ্গ বা দক্ষিণ অসম তো বটেই, উত্তর অসমেও বাংলাভাষী উদ্বাস্তুদের সম্মানজনক পুনর্বাসন দিতে হবে। যদিও উগ্র প্রাদেশিকতার বিষবাষ্প অসম থেকে প্রায় দূর হয়ে গেছে। তবু যদি আবার কোথাও সেই বিষদাঁত বের হয় তবে তাকে উপড়ে ফেলার দায়িত্ব নিতে হবে সর্বানন্দ সোনওয়ালের সরকারকেই।

তৃতীয়ত, অসমের এন আর সি হওয়ার পর পশ্চিমবঙ্গেও পঞ্জিকরণ হওয়া প্রয়োজন। বাংলাদেশের একজন অনুপ্রবেশকারীও (পড়ুন বাংলাদেশি মুসলমান নাগরিক) আর যেন নতুন করে ভারতে না আসেন। খাগড়াগড় থেকে কালিয়াচক, সর্বত্র দেখা গেছে অনুপ্রবেশকারী ভারতবর্ষের জাতীয় সুরক্ষার জন্য কত ভয়াবহ বিপদ।

পূর্ববঙ্গ থেকে সব হারিয়ে এদেশে পালিয়ে আসা বাঙালি হিন্দুদের কাছে নাগরিকত্ব (সংশোধনী) বিল, ২০১৬ আর ন্যাশনাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট আজ দীর্ঘ ৭১ বছর পর এক সুবর্ণসুযোগ এনে দিয়েছে। উদ্বাস্তু আন্দোলনের এতদিনের দাবি আজ রূপ পেতে চলেছে। ■

।। চিত্রকথা।। অভিমন্যু।। ২১

অভিমন্যুর কৃতিত্বে সেনাপতি দ্রোণাচার্য অভিভূত হন।

দুর্যোধন সব দেখে শুনে ক্রুদ্ধ হন।

দুঃশাসন ও অভিমন্যুর মধ্যে দারুণ যুদ্ধ হয়।

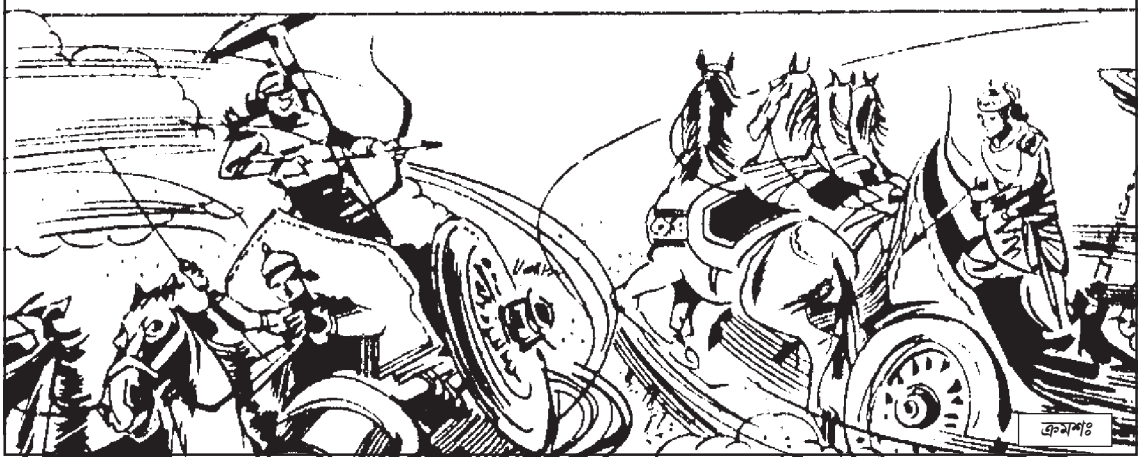

সা প্তা হি ক রা শি ফ ল

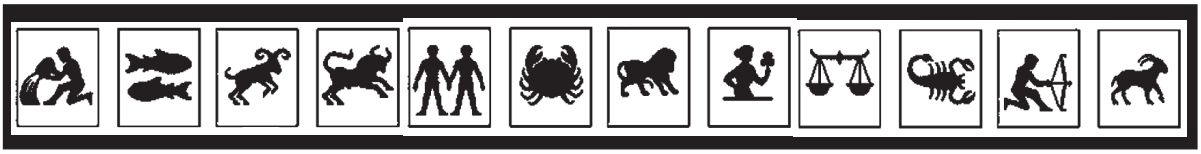

২০ আগস্ট (সোমবার) থেকে ২৬ আগস্ট (রবিবার) ২০১৮। সপ্তাহের প্রারম্ভে কর্কটে বুধ-রাহু। সিংহে রবি, কন্যায় শুক্র, তুলায় বৃহস্পতি, ধনুতে শনি, মকরে বক্রী মঙ্গল-কেতু। রাশি নক্ষত্র পরিক্রমায় চন্দ্র বৃশ্চিকে জ্যেষ্ঠা থেকে কুম্ভে ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে।

মেষ : জ্ঞান, বিদ্যা, শৌখিনতা, উৎসাহ-উদ্যম ও পারিবারিক স্বচ্ছলতা। বয়োজ্যেষ্ঠের শারীরিক কারণে উদ্বেগ। কথাবার্তায় শান্ত ও সংযত থাকুন। সামাজিক-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে গুণীজনের সান্নিধ্যলাভ। সন্তানের সন্তান যোগ। প্রাপ্তি শুভ।

বৃষ : নতুন উদ্ভাবনী চিন্তার বাস্তবায়ন। কবি, লেখক, সাহিত্যিক, আইনজ্ঞ, সাংবাদিকের প্রতিভার স্ফূরণ ও মান্যতা। সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণে গুরুজনের কার্যকরী পরামর্শ। প্রেমের পূর্ণতায় স্বস্তি। সন্তানের বহুমুখী প্রতিভার প্রকাশ ও পরীক্ষায় অনায়াস সাফল্য।

মিথুন : উন্নত রুচি, সংস্কৃতি, সৃজনশীলতা ও অসহায়কে সহায়তায় মানবিকতার প্রকাশ। ব্যবসায় নতুন বিনিয়োগ ও লাইফ পার্টনারের কর্মসংস্থান। ছলনাময়ীর চক্রান্তে পারিবারিক সুস্থিতি বিনষ্ট। গুরুজন, স্নেহভাজনের প্রত্যাশা পূরণ। জ্যোতিষ, ম্যাজিসিয়ান, মঠাধীশ, প্রতিষ্ঠানের প্রধানের সার্বিক শুভ।

কর্কট : ব্যস্ততায় ক্লান্তিবোধ। পারিবারিক স্বচ্ছলতায় কায়িক শ্রমই পাথেয়। মাতার স্বাস্থ্যহানি ও পারিবারিক পরিবেশে অস্থিরতার পরশ। জেদ ও হঠকারিতায় কর্মক্ষেত্রে জটিলতা। উচ্চশিক্ষায় প্রবাস। সপ্তাহের প্রান্তভাগে মনোজ্ঞস্থানে ভ্রমণে যোগ। আর্থিক ভারসাম্য না থাকার সম্ভাবনা।

সিংহ : জ্ঞান, বিদ্যা, অভিজ্ঞতায় আভিজাত্যপূর্ণ জীবন। চিন্তার স্বচ্ছতা ও বুদ্ধিদীপ্ত পদক্ষেপে সুহৃদের সান্নিধ্য ও রাজসম্মান যোগ, সন্তানের কৃতিত্বে বংশগৌরব বৃদ্ধি। অর্থাগমের বিভিন্ন ধারা নতুন আঙ্গিকে উদ্ভাসিত। প্রমীলাবাহিনীর প্ররোচনা পরিহার করুন, অন্যথা সময় ও অর্থের অপচয়।

কন্যা : লটারি, শেয়ার, ব্রোকার, প্রমোটার, এক্সপোর্ট-ইমপোর্টের কর্ম ও আর্থিক প্রাপ্তি ইতিবাচক। কথাবার্তা ও লিখিত কাজে সতর্ক থাকা দরকার। উদারতা, সামাজিকতা, মানবিকতায়, সমাজকল্যাণ মূলক কর্মে মানসিক প্রশান্তি। যুবক প্রতিবেশী হিতকারী নয়, প্রিয়জনের শুভ কাজে ইতিবাচক পদক্ষেপ, সপ্তাহের শেষভাগে, উদাসীনতা, অবসন্নতা ও একাকীত্ব বোধ।

তুলা : শরীরের যত্নের প্রয়োজন। ন্যায্য প্রাপ্তিতে সহকর্মীদের ঈর্ষা। প্রবাসী পরিজনের গৃহে প্রত্যাবর্তন। ব্যবসায় বিনিয়োগ ও বহুমুখী আয়ের প্রশস্ত পথ। কর্ম অথবা শিক্ষার্থে স্থানান্তর গমন। খনিজ ও পরিবহণ ব্যবসায় প্রাপ্তি শুভ। বৈষয়িক সমৃদ্ধি ও নারীর সান্নিধ্য লাভ।

বৃশ্চিক : শিশুর সারল্য ও বাক্‌পটুতায় সমাদর লাভ। বস্ত্র, ঔষধী, স্টেশনারি, প্রকাশনা ও শৌখিন দ্রব্যের ব্যবসায় ভাল প্রাপ্তি যোগ। বেকারত্বের অবসান, পেশাদারদের মর্যাদা ও দায়িত্ব বৃদ্ধি। নিকট প্রতিবেশী সন্তানের মনশ্চাঞ্চল্যের কারণ। পরিণয়ে প্রেমের পূর্ণতা, স্বজন সম্পর্কে উন্নতি। মস্তক, কাঁধে আঘাতের সম্ভাবনা ও ব্যয়াধিক্য যোগ।

ধনু : উদারতা, উৎফুল্লতা, চিন্তার স্বচ্ছতা, সরলতা, সততা, ভক্তি, শ্রদ্ধায় সুন্দর ও বর্ণময় জীবন। গবেষক, প্রযুক্তিবিদ, শল্যচিকিৎসক, প্রশাসকদের কর্মদক্ষতায় শংসা প্রাপ্তি। স্ত্রী অর্থ ও ভাগ্যোন্নতির সহায়ক। ভ্রাতা-ভগ্নীর দুর্ঘটনা জনিত উদ্বেগ। বহুদিনের ঝুলে থাকা সমস্যার সমাধান। হঠাৎ প্রাপ্তি যোগ।

মকর : আয়ের শ্লথগতি। কর্মপরিবর্তন বা কর্মচ্যুতির সম্ভাবনা। গৃহ সংস্কারে ব্যয়। মতাদর্শগত বিরোধিতায় আপোশ। পুলিশ, সেনানী, ক্রীড়াবিদ, নেতা-নেত্রীর কর্মদক্ষতা ও জনপ্রিয়তা, সপ্তাহের প্রান্তভাগে প্রণয়ের লুব্ধ দৃষ্টিতে ছন্নছাড়া উদাসী জীবন। হঠাৎ চোট-আঘাতের সম্ভাবনা।

কুম্ভ : ভ্রাতা, ভগ্নীর কর্ম সংক্রান্ত সুখবর। একাধিক উপায়ে অর্থাগমের যোগ। কর্মসূত্রে প্রবাস। নতুন ব্যবসায়িক পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়ন। মামলা-মোকদ্দমার ফল অনুকূলে আসতে পারে। পিতার স্বাস্থ্যাবনতি, প্রতিবেশী ও মিত্রস্থান হিতকারী।

মীন : পরিজন প্রিয়, শত্রুঘ্ন, বন্ধুপ্রিয়, লোকমান্য বিদ্বান, পুত্রবান ও আভিজাত্য গৌরব। কর্ম ও চিন্তা চেতনায় মূল্যবোধের পরিসর বৃদ্ধি। সমাজ প্রগতিমূলক কাজ, আর্তজনের সেবায় নিরলস প্রয়াস ও কাঙ্ক্ষিত ফললাভ। সাহিত্য পিপাসু ও বিদ্যার্থীর জ্ঞানান্বেষণে প্রতিভার স্ফুরণ ও নব আনন্দে পথ চলা।

● *জন্ম ছকের স্বাতন্ত্র্য ও দশা-অন্তর্দশা না জানায় কেবল গোচর ফল বর্ণিত হলো।*

—শ্রী আচার্য্য